VOLUME 3 | YEAR 2018

ISSN No. 2456-4206

THE CENTURION

TEACHERS' COUNCIL JOURNAL

(PEER-REVIEWED MULTIDISCIPLINARY JOURNAL)

A PUBLICATION OF THE TEACHERS' COUNCIL

ASUTOSH COLLEGE

VOLUME 3 | YEAR 2018
ISSN : 2456-4206

THE CENTURION

TEACHERS' COUNCIL JOURNAL

(PEER-REVIEWED MULTIDISCIPLINARY JOURNAL)

A PUBLICATION OF THE TEACHERS' COUNCIL
ASUTOSH COLLEGE

VOLUME 3 | YEAR 2018
ISSN : 2456-4206

The Centurion
Asutosh College Teachers' Council Journal

(Multidisciplinary Journal)

Published on 17 July, 2018

Copyright © Asutosh College, Kolkata, India 2018. All rights reserved. No part of this journal may be reproduced or transmitted in any form, by mimeograph, stored in a database or any retrieval system or by any means whatsoever without written permission from the Publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews, with proper acknowledgement.

Publication Information

Published by Sri Apurba Ray, Vice-Principal, Asutosh College and Chairman, Teachers' Council, Asutosh College, 92, S. P. Mukherjee Road, Kolkata, India, PIN-700 026.

Address for Communication

Secretary, Asutosh College Teachers' Council
92, S. P. Mukherjee Road, Kolkata, India, PIN-700 026
E-mail : mail@asutoshcollege.in
Website : www.asutoshcollege.in
Phone No. : (033) 2454 2372, 2486 3912

Printing Press
LASERWORLD
P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014
Phone : 9831 1 61961

Price : ₹ 300.00

Message from Vice-Principal

The third issue of the Asutosh College Teachers' Council, *The Centurion*, is all set for publication, thanks to the concerted efforts of the members of the college teaching staff and the editorial team. A rich and varied collection of articles on diverse subjects of interest, it will provide intellectual stimulation to all its readers. My best wishes remain for the continued success of the effort.

Apurba Ray
Vice-Principal, Asutosh College

VOLUME 3 | YEAR 2018
ISSN : 2456-4206

Editorial Board

Chief Advisory Editor :

Dr. Dipak Kumar Kar, Principal

Chief Editor :

Prof. Apurba Ray, Vice-Principal

Joint Editors :

Dr. Sajal Bhattacharyya

Dr. Abhik Kundu

Dr. Keya Ghosh

Dr. Sraboni Roy

Dr. Rina Kar (Dutta)

Associate Editors :

Dr. Tapti De

Dr. Sayani Mukhopadhyay

Dr. Tathagata Ray Chaudhuri

Prof. Bhaskar Mridha

Editor Members :

Dr. Supatra Sen

Dr. Prabir Rudra

Dr. Deep Chandan Chakraborty

Dr. Amit Kumar Bhattacharjee

Editorial

The third volume of The Centurion, the journal of the Asutosh College Teachers' Council has now seen the light of day. The enthusiasm of the members of the council is the strength behind this herculean task of publishing a journal in three uninterrupted consecutive volumes. All three volumes reflect the research-oriented mindset of the members of faculty. Today, it is becoming an increasingly difficult task for teachers to take out time from their curricular duties and engage in extra-syllabus research work, but the effort to do so, fortunately remains. Like the first two volumes, the contents of this third issue is also a manifestation of the multifaceted research activities of the teaching staff. The diversity of topics – from humanities and literature to the sciences, including Mathematics – accommodated in the journal will surely attract authors from other institutes in due time. The motto of the Council is to extend the spread of the journal so that to the teaching and research community of the state, it may soon become a volume worth publishing in.

The editors would like to thank all members of the college administration for their wholehearted support and cooperation in ensuring the successful publication of this third issue.

~CONTENTS~

1.	**ছোটগল্পকার বিমল কর ঃ ঐতিহ্যানুসৃতি ও স্বাতন্ত্র্য** — ড: মানস কবি	1-6
2.	**বাংলা সাহিত্যে পাখি** — কবি বক্সী	7-15
3.	**नारी : दशा और दिशा** — संजय साह	16-19
4.	**ROMANTIC LOVE AND CAPITALISM: A GOOD MATCH IN LATE-MODERNITY AS DEBUNKED BY EVA ILLOUZ** — Soumen Das	20-23
5.	**IS DEEP FRYING IN COOKING OIL SAFE? THINK BEFORE YOU EAT** — Dr. Keya Ghosh	24-37
6.	**FIBONACCI NUMBERS AND THEIR APPLICATIONS** — Ashim Sarkar	38-50
7.	**OBSERVATION OF EQUATORIAL IRREGULARITIES BY MST RADAR AND GPS IN A COLLOCATED IONOSPHERIC VOLUME** — Dr. Aditi Das	51-58
8.	**UNIQUE WASTE WATER CULTURE SYSTEM – HIDDEN GEM OF KOLKATA PORT TRUST AREA** — Basudha Basu	59-64

ছোটগল্পকার বিমল কর ঃ ঐতিহ্যানুসৃতি ও স্বাতন্ত্র্য

ড: মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আশুতোষ কলেজ
ই-মেইল : manas.kabi@asutoshcollege.in

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার রূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদচারণার পূর্বে কেউ কেউ ছোটগল্প সাহিত্য-শাখাটিকে বিকশিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) প্রমুখ। এঁরা গল্পের গঠন তথা রূপবৈচিত্র্য নিয়ে বেশি না ভেবে গল্পের বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসের দিকেই জোর দিয়েছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরপর ছ'টি গল্প ('দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি') লিখে বাংলা ছোটগল্পের রূপরীতির নব দ্বারোদ্‌ঘাটন ক'রে ছোটগল্প রচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। খণ্ডিত সমাপ্তি, চরিত্র বিরলতা, কাহিনির একমুখিতা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পরূপটিকে যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পথে 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩) প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত অনেকেই এই নব শিল্পরূপটিকে পরিচর্যা ও লালনপালন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), প্রমথ চৌধুরী (১৮৫৮-১৯৪৬), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), পরশুরাম (রাজশেখর বসু, ১৮৮০-১৯৬০) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল নবীন গল্পকারের আবির্ভাব হয়। এঁরা রবীন্দ্রানুসৃতির পথ পরিহার করে বাংলা ছোটগল্পে একটি স্বতন্ত্র ধারা সংযোজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। গল্পে বিষয়ের অভিনবত্ব এনে বাংলা ছোটগল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এই ধারায় গল্পকার জগদীশ গুপ্ত বাংলা ছোটগল্পের বিষয়ের মধ্যে অবচেতন মনের নানা ক্রিয়াকলাপ ও নিয়তিবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন। পরে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) এই ধারাকে আরো পরিপুষ্ট করেছিলেন।

এরপর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় 'ইঁদুর' ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে গল্পকার বিমল কর (১৯২১-২০০৩) বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদচারণার ধ্বনি শুনিয়েছিলেন। ১৯৫০-৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গল্পকার বিমল কর 'ছোটগল্প ঃ নূতন রীতি' এই শিরোনামে ছোটগল্পের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এক নূতন রীতির গল্প-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের পাঠক এক ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্প পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিল। তিনি প্রচলিত বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। উপহার দিয়েছিলেন এক ভিন্ন রীতির গল্প। বিমল করের পূর্ব পর্যন্ত সব লেখকই ছোটগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে গল্প রচনা করেছেন। বিমল করের পূর্বে ছোটগল্পের প্রচলিত গল্প-বয়নের মধ্যে কেউ কেউ অভিনবত্ব

এনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা প্রচলিত গল্প-কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, কেউ বিষয়ে অভিনবত্ব এনেছিলেন, কেউ পরিসমাপ্তিতে, কেউ চরিত্র-নির্মাণে, আবার কেউ কেউ আকারে বা পরিধিতে অভিনবত্ব এনেছিলেন। কিন্তু বিমল কর ছোটগল্পের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

প্রথমেই যে বিষয়ের উল্লেখ করতে হয় তা হল, তিনি ছোটগল্পের রূপের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ছোটগল্প আকারে 'ছোট' হবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি গল্প লেখেননি। তাঁর রচিত প্রায় প্রত্যেকটি ছোটগল্প আকারের দিক থেকে ছোটগল্পের প্রচলিত মাপকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি ছোটগল্পের আকারকে বর্ধিত করেছেন বলেই তাঁর গল্পগুলিকে 'ছোটগল্প' আখ্যায় ভূষিত করা যাবে না, এমন কথা বলা অসঙ্গত হবে। 'ছোট' কথাটির নির্দিষ্ট কোনো অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে চাননি। 'ছোট' কথাটা তাঁর কাছে আপেক্ষিক বলে মনে হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলিকে শিল্পরসোত্তীর্ণ ছোটগল্প বলা যাবে না। বাংলা ছোটগল্পের পাঠককে নতুন স্বাদ দেওয়ার জন্য যে যে পথ অবলম্বন করা দরকার, তা তিনি করে দেখিয়েছেন। ছোটগল্পকে 'ওয়ান সিটিং'-এ পড়ে ফেলার তত্ত্বকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন —

> ''... এই তত্ত্বের দোষ এই যে, কোনো পাঠক চার পাতার লেখা চার দফায় পড়েন,
> কেউ বা বিশ পাতার লেখা অক্লেশে এক দফায় (ওয়ান সিটিং) দিব্যি পড়তে পারেন।
> বস্তুত, এই তত্ত্বটি পাঠকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করার কাজে লাগতে পারে।''[১]

— এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি গল্প রচনা করেছেন। তাঁর এই চিন্তা যুক্তিগ্রাহ্য।

তিনি গল্পে হঠাৎ চমক সৃষ্টি করেননি। প্রথমে তিনি গল্পে উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করেছেন। তারপর পরিণতির দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়েছেন। তার অর্থ এই নয় যে, পাঠক গল্প পাঠ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তিনি গল্পকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কৌতূহল বা গল্পপাঠের আগ্রহকে ক্রমোত্তর আকর্ষণীয় রাখতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। পাঠক যদি মনে করে থাকেন, গল্পের গিঁটে গিঁটে তার কৌতূহলের উদ্রেক চাই, তা বিমল করের ছোটগল্পে মিলবে না।

তাঁর বেশিরভাগ গল্পই ভাবধর্মী। তাঁর বেশিরভাগ গল্পে একটি পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি মূলত মানুষের মনের অন্তর্জগতকে তাঁর রচনায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তাঁর গল্পে বাইরের জগতের বড়সড় ঘটনা অনুপস্থিত। তাঁর রচিত গল্প মনোজগতের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আলোছায়ার পথে এগিয়ে চলে।

তাঁর গল্পে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রমুখের মধ্যে একটি সাধারণ গুণ লক্ষ করা যায়। তারা প্রত্যেকেই ভাবজগতের অধিবাসী। তাদের আনন্দ, বিষণ্ণতা, সংশয় ও বিস্ময়ের মধ্যে অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়। তারা প্রত্যেকে যেন দার্শনিক। তাদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব জগত আছে। পাঠক একবার ঐ জগতে প্রবেশ করলে তার মনের মধ্যে ঐ জগত সম্পর্কে অদ্ভুত মোহ তৈরি হবে, পাঠকের মনের মধ্যে দীর্ঘদিন একটা ছাপ থেকে যাবে।

তাঁর বর্ণনাশক্তিকে তারিফ করতেই হবে। তাঁর বর্ণনার জগত কখনোই কৃত্রিম নয়। গল্পকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এমনভাবে বর্ণনাকে উপস্থিত করেছেন, যার মধ্যে কোনো চরিত্র বা পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিচয় সম্পর্কে পাঠক অকৃত্রিম ভাব উপলব্ধি করতে পারেন। যেমন —

''সারাটা দিন মাঠ মুখে করে বসে থাকা। গ্রীষ্ম কেটেছে, তখন তেমন করে যেন মাঠটা দেখেনি নবেন্দু। বর্ষার দিনে অতসী জলের ঝাপটার ভয়ে প্রায়ই জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে যেত। তারপর ধীরে ধীরে বাইরের ওই রুক্ষ্ম নুড়ি-ছড়ানো আদিগন্ত মাঠটার সঙ্গে নবেন্দুর পরিচয়। এখন শীত। পৌষের শীতে কিছু লালচে ধুলো, কিছু নুড়ি, বিক্ষিপ্ত বুনো ঝোপ, দু-পাঁচটা গাছ আর ধু ধু মাঠখানা চোখের সামনে নিয়ে সারাদিন বসে আছে নবেন্দু।''[২]

— এই বর্ণনার মধ্যে পরিবেশ এবং চরিত্র যেন একে অপরের পরিপূরক। চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে কিংবা পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পৃক্তি বোঝাতে তিনি ঐ বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন। বর্ণনাগুলি কখনোই অলস ছবি নয়, কিংবা কৃত্রিম অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট নয়। এই রকম বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্প এগিয়ে গিয়েছে।

তিনি গল্পে গতি আনতে সংলাপের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর সংলাপের যে গুণটি চোখে পড়ে তা হল, হ্রস্ব বাক্যে পাত্র-পাত্রীর মুখে তিনি সংলাপ বসিয়েছেন। অনেক সময় সেই বাক্যকে একটি দুটি শব্দে গতিময়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহার করেছেন। যেমন —

''বাহাদুর!'

'জী, মেমসাব!'

'বাহার চলো।'

'নুনিয়া মেমসাব?'

'হ্যাঁ।'

'কুত্তা?'

'লে লেও!'

'গান্—?'

'জরুর।''[৩]

এইরকমভাবে তাঁর গল্পে সংলাপ এগিয়ে যেতে থাকে। পাঠক দুরন্ত গতিতে গল্পপাঠে নিমগ্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়ে যান। সংলাপের ক্ষেত্রে এইরকম বৈশিষ্ট্য তাঁর অধিকাংশ গল্পেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বিমল কর তাঁর গল্পে বাক্যরচনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি বেশিরভাগ হ্রস্ব বাক্যের মাধ্যমে তাঁর গল্প রচনা করেছেন। কখনো-কখনো তা এতই ক্ষুদ্র যে, মাত্র একটি শব্দে একটি বাক্য গঠিত হয়েছে। এছাড়া গল্পের মধ্যে ক্রিয়াহীন বাক্যও মাঝে মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছে, যেমন —

১) ''মোহন চা নিয়ে এল। রাখল। তাকে ইশারায় আমি কিছু বললাম। সে আমার ডানপাশের ঘরের দরজার চাবি খুলল। ভেতরে গেল। ফিরে এল। ইশারায় জানাল — সব ঠিক আছে।''[৪]

২) ''নিরুপমা আর অনুপমা। ছোট করে নিরু আর অনু। দুই বোন। বড় নিরু ছোট অনু। বড়য়-ছোটোর তফাতটা বাইশ মাসের।''[৫]

বিমল কর গল্পে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। শব্দচয়নের মাধ্যমে গতিময়তা আনতে বাক্যকে মেদহীন করেছেন। আবার ছোট ছোট বাক্যে অসাধারণ চিত্রকল্পও ফুটিয়ে তুলেছেন, যেমন —

১) 'তেমনি খই ছড়ানো জ্যোৎস্না, দক্ষিণের হাওয়া, উমার লাবণ্যভরা মুখ।' ('পলাশ')

২) 'আবহাওয়াটা কেমন ক্লান্ত, অলস, তন্দ্রাজড়ানো।' ('পলাশ')

৩) 'ছাই, জঞ্জাল, ফণিমনসা ডাকা এক মানুষ-গা অন্ধকার গলি।' ('মানবপুত্র')

৪) 'খোলা দরজা দিয়ে ভাল্লুক-গা অন্ধকার ঢুকছে।' ('কাঁচঘর')

৫) 'মনে হল, ধবল জ্যোৎস্নার কোন অদৃশ্য কুহক মোহ বিস্তার করেছে পূর্ণেন্দুর চোখে, মনে, চেতনায়।' ('উদ্ভিদ')

৬) 'চকিতে সেই শ্বেতস্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।' ('পালকের পা')

৭) 'আমার ভালোবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত।' ('সুধাময়')

৮) 'গালের ঢল চিবুকের কাছে কচি আমপাতার মতন বেঁকে আছে।' ('বাঘ')

৯) 'একটা কথা যেন ভয়ংকর অন্ধকার থেকে খানিকটা মুখ বার করে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছে।' ('যযাতি')

১০) 'গাছ বাঁচে তার শেকড়ের রসে। জীবন বাঁচে স্বপ্নে আর আশায়'। ('নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা')

কথাসাহিত্যিক বিমল কর বাংলা ছোটগল্পের নতুন শৈলী নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বকর্মা। তিনি বাংলা ছোটগল্পের মুকুটে নতুন পালক গুঁজে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু গল্পের জন্য গল্প তিনি লেখেননি। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতাকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করে। সমুদ্র থেকে যেমন মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করা যায়, তেমনই বাংলা ছোটগল্প সাহিত্য তাঁর শিল্পসৃষ্টি থেকে জীবন-অভিজ্ঞতাজাত এক-একটি রত্নস্বরূপ ছোটগল্প পেয়েছে। তাঁর জীবনসংগ্রামের পরিচয় তাঁরই রচিত স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'উড়ো খই' (১ম ও ২য় খণ্ড)-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ছোটগল্পকাররূপে তিনি মানবজীবনের প্রায় সমস্ত শাখা-উপশাখাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন।

বাইরে সংঘটিত কোনো ঘটনা কীভাবে ব্যক্তিমনে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তারপর ঐ ব্যক্তির মনের ভাবরাজ্যে কী কী ঘটে, তার সূক্ষ্ম পরিচয় বিমল করের গল্পে উপস্থিত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা কেউ বা দার্শনিক, কেউ বা ভাবুক, কেউ বা তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে স্বতন্ত্র। তিনি তাদের প্রত্যেকের মনোরাজ্যের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বকে সুন্দরভাবে, সহজ-সরল-সাবলীলতার সঙ্গে তিনি তাঁর গল্পে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের নিপুণ চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

মৃত্যুচেতনা বিমল করের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর অধিকাংশ গল্পে মৃত্যু কোনো-না-কোনো ভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি বাংলা ছোটগল্পের পাঠককে মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক উপলব্ধির জগত উপহার দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে কোনো লেখকের ছোটগল্প রচনায় মৃত্যু এভাবে উপস্থিত হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র মৃত্যুর সঙ্গে কথোপকথন করছেন, মৃত্যুর আসার প্রহর গুনছেন — এরকমটি বিমল করের পূর্বের রচিত

ছোটগল্পে লক্ষ করা যায় না। বিমল করের গল্প পাঠ করলে, পাঠকের মৃত্যুর সম্পর্কে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি ঘটবে — একথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যায়।

জীবনের একটি বড় সত্য মৃত্যু তাঁর অধিকাংশ গল্পের মূল শিকড় বা কখনও শাখা-শিকড়। মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যু-সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা তাঁর প্রায় গল্পের মূল রস। সেই সঙ্গে মানুষের অবসাদ, বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব, অন্তর্বর্তী সংঘাত, দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা, সংশয় — এসবই তাঁর গল্পের প্রাণরসের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। গল্পে দাম্পত্যজীবন প্রবাহের মধ্যে জটিলতা, চোরাগলি ও অন্ধকার দিকের সন্ধান এবং তার বাস্তবোচিত মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় তাঁর তুলনা হয় না। সমাজনিষিদ্ধ অবৈধ প্রণয়-বর্ণনায় তাঁর রুচিবোধকে তারিফ করতেই হবে। আসলে মননধর্মিতায়, জীবনের জটিলতর শিল্পরূপায়ণে, ব্যক্তি মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি নিপুণ শিল্পী। সমাজের দ্বারা প্রতারিত, বঞ্চিত তথা পতিতাজীবনের ছবি তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ কথাকার। এই বিষয়ে তাঁর 'আঙুরলতা' গল্পটি সারা বিশ্বে যে-কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়।

শুধু 'আঙুরলতা' নয়, 'ইঁদুর', 'মানবপুত্র', 'সোপান', 'সুধাময়', 'নিষাদ', 'অপেক্ষা', 'কাঁটালতা', 'সংশয়', 'যযাতি', 'সত্যদাস', 'নদীর জলে ধরা-ছোঁয়ার খেলা' প্রভৃতি গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হওয়ার যোগ্যতা দাবি করে। আত্ম-আবিষ্কারের শুদ্ধ প্রয়াস অথবা চেতনাপ্রবাহে নিবিষ্ট হয়ে জীবনের গভীর তলদেশকে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ছোটগল্পে ব্যক্ত করার প্রয়াস তিনি প্রথম গল্প-সৃষ্টি থেকে করতে পেরেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা নিস্পন্দ অতিচারিতার মধ্য দিয়ে যেভাবে তাদের ফেলে আসা হতাশা, দুঃখ, বেদনা ব্যক্ত করেছে — এই পদ্ধতিটি বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে অভিনব।

ব্যক্তির জীবনচিন্তা, প্রেমভাবনা, মৃত্যুচিন্তা, স্বপ্ন-জাগরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ-চিন্তা, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ — সবই বিমল কর অত্যন্ত যত্ন-সহকারে, নিষ্ঠার সঙ্গে, 'মজুরের মতন' করে একে একে তাঁর গল্পে গেঁথেছেন। কখনো কখনো তা রূপক ও প্রতীকের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। এই বিষয়গুলোকে গল্পে তুলে ধরতে তাঁর মধ্যে অস্থিরতা বা চঞ্চলতা লক্ষ করা যায় নি। তিনি একের পর এক শব্দ দিয়ে ঐ অনুভূতিগুলিকে ধীর-স্থির শান্ত ভঙ্গিতে গল্পে পরিবেষণ করেছেন। এই কারণে তাঁকে যথার্থ জীবনশিল্পীর আখ্যা দিতে হবে।

বিমল করের গল্পে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত ও পরাবাস্তবতার জগতের অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটেছে। তিনি যখন এই দুই জগতের মধ্যে আনাগোনা করেছেন, তখন জীবনের সত্যগুলি যেমন সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা এবং মৃত্যু তাঁর অনুভবের মধ্যে যুক্ত হয়ে ঐ জগতকে গল্প-মধ্যে আরো অর্থপূর্ণ করে তুলতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। তাঁর বর্ণনার গুণে পাঠক গল্প পাঠ করতে করতে নিজের অনুভূতির মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য এক জগতকে খুঁজে পেতে পারেন।

বিমল কর বাংলা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ভাঙার কারিগর এবং ঐতিহ্য গড়ার ক্ষেত্রে কালজয়ী সৃষ্টিকর্তা। তিনি বাংলা ছোটগল্পের শৈলীতেও নতুন জোয়ার এনেছিলেন। বাংলা ছোটগল্প রচনার প্রচলিত শৈলীকে নস্যাৎ করে তিনি 'নূতন রীতি'র গল্প রচনার ক্ষেত্রে শিল্পদক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। শুধু গঠনগত কলাকৌশল নয়, ছোটগল্পের ভাবজগতের মধ্যেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলেন।

ছোটগল্পে ভাষার ব্যবহারে, শব্দনির্বাচনে ও বাক্যগঠনে তিনি অত্যন্ত যত্ন নিয়েছেন। এইসব বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই গল্পে তিনি ভাব প্রকাশে আড়ষ্ট ছিলেন না। সচেতনভাবে শব্দ ব্যবহারের ফলে গল্পের বর্ণনা

ও সংলাপের মধ্যে গতি সৃষ্টি হয়েছে। পাঠক সেই গতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে দ্রুত গল্পের রস বা স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। গল্প-পাঠ শেষে পাঠকের মনে সম্পূর্ণ গল্পটির বিষয়ে একটি বিশেষ অকৃত্রিম অনুভূতি জেগে ওঠে। এই অনুভূতির স্বাদ জাগানোর ক্ষেত্রে ছোটগল্পকার বিমল করের শৈলী তুলনাহীন। বাংলা ছোটগল্পে ঐ বোধ ও চিন্তার দিক থেকে তিনি একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছিলেন।

বাংলা ছোটগল্প রচনায় বিমল কর প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করে এক নতুন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের পাঠক বিমল করের হাত ধরে সেই পথের রূপ-রস শোভা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বাংলা ছোটগল্পের রূপরীতি, গঠন-বিন্যাস বদলে দিয়েছিলেন। পাঠকেরা তা মেনে নিয়েছেন। তিনি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আজও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ঐতিহ্য গড়ার কারিগর। বাংলা ছোটগল্প বিমল করের লেখনী-স্পর্শে অনেকটা পথ পরিক্রমা করতে পেরেছে। বাংলা ছোটগল্পের পাঠক তাঁর ছোটগল্পের শৈলীকে কখনোই ভুলতে পারবে না।

তথ্যসূত্র :

[১] বিমল কর, 'ছোটগল্প : নূতন রীতি', দ্রষ্টব্য সন্দীপ দত্তের 'বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক' গ্রন্থ, র‍্যাডিক্যাল ইম্পেশন, মে ১৯৯৩, পৃ. ৩০

[২] বিমল কর, ''শীতের মাঠ'', 'পঞ্চাশটি গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ. ১৮৫

[৩] বিমল কর, ''জানোয়ার'', 'পঞ্চাশটি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

[৪] বিমল কর, ''নিগ্রহ'', ''পঞ্চাশটি গল্প'', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৫

[৫] বিমল কর, ''দুই বোন'', 'পঞ্চাশটি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

বাংলা সাহিত্যে পাখি

কবি বক্সী
(SACT, Communicative English)
Asutosh College
ই-মেইল : tripurari.baksi@asutoshcollege.in

এক ঝলকে

পৃথিবীতে পাখির আবির্ভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতের অন্ত নেই। তবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের পারম্পর্য নিয়ে মতপার্থক্য বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে। কারণ পাখি মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের কাহিনী এককথায় সর্বজন স্বীকৃত। এই সম্পর্ক একেবারে শুরুর দিন থেকে। পুরাণ থেকে মহাকাব্য, ইতিহাস থেকে বিজ্ঞান ভাবনা, শৌর্য থেকে শৈল্পিক প্রদর্শন — পাখি জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মন ও মননের প্রতিটি আনাচে কানাচে। পরিচিতি পেয়েছে কখনো সহায়ক কখনো সহযোগী আবার কখনো উপকারি বন্ধু হিসেবে।

মানুষের সাহিত্য, দর্শনের প্রারম্ভিক পর্বের সূচনাও হয়েছে পাখিকে নিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই তার আচার আচরণ, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে পাখিকে ঘিরে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের সৌন্দর্য চেতনায় যেমন রয়েছে পাখি, তেমনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ছত্রে ছত্রেও যুক্ত হয়েছে তাদের আচরণবিধি। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, বাইবেল, গীতা, পিটক, ত্রিপিটক, জাতক, কোরান-সহ প্রাচীন প্রায় সমস্ত ধর্মগ্রন্থেই পাখিদের নজরকাড়া উপস্থিতি মানুষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করেছে।

প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষ করে বিভিন্ন কল্পধর্মী গ্রন্থে বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে বহু ধরণের পাখির নামও যুক্ত হয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন শিকারী ও কাল্পনিক পাখির উপস্থিতিও। তবে পাখি ও মানুষের ভাবনার যোগসূত্র গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক বিষয়টিও। এই দু'টি বিষয়ের প্রভাব যে অনেকটাই সেটা বুঝে নিতে বিলম্ব করেননি কোনো বিশেষজ্ঞই।

পৃথিবীর কোথায় কোন পাখি বাস করে, তাদের স্বভাব চরিত্র কেমন, তাদের খাবার, বেঁচে থাকা, গান গাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ভর করে সেই এলাকার ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া-জলবায়ুর ওপর। তাছাড়া পাখিদের পরিযায়ী হওয়ার পিছনেও রয়েছে এই প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক দিকটি। একটা সময় ছিল যখন মানুষ পরিযায়ী পাখিদের গতিবিধি দেখে আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তনের দিকটি নির্ধারণ করতেন।

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পাখি কতখানি জড়িয়ে রয়েছে সেটা বোঝা যায় আমাদের প্রাচীণ সাহিত্যগুলির দিকে নজর ফেরালে। মহাকবি বাল্মীকি প্রথম যে শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন, সেটি ব্যাধের হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে একটি কোঁচ বকের মৃত্যু দেখে। গভীর বেদনাহত হয়েই কবি লিখেছিলেন পৃথিবীতে পাখি বিষয়ক প্রথম শ্লোক, 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। / যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।'(নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না, কারণ তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছিস)।

পাখিকে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে 'মহাভারত'-এও। সেখানে পাখি একটি বক যে ধর্মের ছদ্মরূপ নিয়েছে। সরোবরের কিনারায় বসে পঞ্চপাণ্ডবের দূরদর্শিতার পরীক্ষা নিচ্ছে। পৃথিবীর প্রাচীন দুই মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এ যেসব পাখির কথা বলা হয়েছে তারা নিছক পাখি হিসেবে নয়, বহুক্ষেত্রে গল্পের চরিত্রও হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গড়ুঢ় পাখি। শৌর্য, দক্ষতা ও ক্ষমতায় যে স্বয়ং ঈশ্বরকেও টেক্কা দিয়েছে। এভাবে প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-দর্শনে পাখি হয়ে উঠেছে অনন্য প্রতীকী শক্তি।

শুধু প্রাচীন সাহিত্যই নয় আধুনিক সাহিত্যেও পাখিকে ব্যবহার করা হয়েছে কখনো চিত্রকল্প হিসেবে আবার কখনো প্রতীক হিসেবে। তবে অনেক সাহিত্যিকই পাখিকে তাঁদের রচনায় গুণপরিবৃত্তি (pathetic fallacy) হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

পর্ব পরিক্রমা

পাখি নিয়ে প্রায় সব মানুষের মনেই আলাদা একটা ভালোলাগার জায়গা রয়েছে। বিশেষ করে সৃজনশীল মানুষের কাছে। তাই পাখি কখনো কাব্যে, কখনো সাহিত্যে আবার কখনো শিল্পে রূপ পেয়েছে নানান ভাব ও ভঙ্গিমায়। এপ্রসঙ্গে ভাবুক বাঙালীর কথা আলাদা করে না বললেই নয়।

বাংলার প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক গঠন এখানকার মানুষজনকে একদিকে যেমন খানিকটা কল্পবিলাসী হতে সাহায্য করেছে, তেমনি কল্পনার অবগাহে স্নাত করতে করতে তাকে করে তুলেছ ভাববিলাসী। নীল আকাশের বুকে উড়ে চলা পাখির কোমল ডানায় ভর করিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছে অচীণপুরের দেশে। যেখান থেকে সে খুঁজে নিতে পেরেছে পাখিদের অমেয় রূপটি।

বলা যেতে পারে, বাংলার প্রায় প্রত্যেক কবির সঙ্গে পাখির একটা আত্মিক মেলবন্ধন রয়েছে। বাংলার পল্লী প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরালে জীবন বৈচিত্রের প্রচুর নিদর্শন যেমন নজরে পড়ে, তেমনি প্রমাণ মেলে জীবনের নানান ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে তার প্রভাবের দিকটিও। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের কল্পনায়, বিস্ময় বিহ্বলতায়, ভাব ও ভাবনায় ঘুরে ফিরে এসেছে পাখিদের আচার আচরণ। কখনো বন্ধু, কখনো আত্মীয়, কখনো সহকারী, আবার কখনো ভালোমন্দের মূর্ত কলেবরে চিরন্তন দোসর।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের কবিরা কাক, কোকিল, শালিক, ঘুঘু-সহ বহু পাখির কথা উল্লেখ করেছেন তাদের লেখায়। ব্যতিক্রমী নন মধ্যযুগের কবিরাও। এসময়ের কবিরা তাঁদের কাব্য চর্চায় বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে বিবিধ পাখির কথাও বলেছেন। যেসব পাখিরা মানুষের কাছে কখনো শুভ, কখনো অশুভ, আবর কখনো নিছক রহস্যবাহী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও জুড়ে রয়েছে একাধিক পাখির নাম। উনিশ শতকের অনুবাদ সাহিত্যে বেশ কিছু পাখিকে দেখা যায়। এপ্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'-কাব্যে একটি শকুন পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাখিটি মাতৃস্নেহে একটি শিশু কন্যাকে রক্ষা করেছে।

*****

দুই বাংলার আধুনিক কাব্য ও ছোটগল্পের বিভিন্ন ধারায় স্থান পেয়েছে বিচিত্র সব পাখি। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী কালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের লেখাতেও ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন ধরণের পাখির নাম। এসব লেখকদের রচনা কুশলতায় পাখিরা হয়ে উঠেছে মূর্ত চরিত্রস্বরূপ।

বহু লেখক ও কবির রোমান্টিক ভাবনায় প্রতীকী রূপ পেয়েছে পাখি। এক্ষেত্রে রূপকধর্মী লেখাগুলির গুরুত্বই আলাদা। এধরণের লেখায় পাখির নামটি হয় শিরোনাম হিসেবে, নয়তো গল্পের প্রধান চরিত্র হিসেবে ফুটে ওঠে। বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, এসব লেখকেরা সমাজ সংস্কৃতির এমন একটি ছবি ধরার চেষ্টা করেছেন যেখানে পাখির উপস্থিতি ছাড়া অনেক ব্যাখ্যা-ই অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

বাংলাদেশের লেখক হাসান হাফিজুর রহমানের 'একজোড়া পাখি', হাসনাত আবদুল হাইয়ের 'সোয়ালো', হাসান আজিজুল হকের 'শকুন' ইত্যাদি গল্পগুলির সাথে এপার বাংলার লেখক বনফুলের 'চোখ গেল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইদুমিয়ার মোরগ' ইত্যাদি গল্পগুলি পাখির নামে নামকরণেই থেমে থাকেনি ঘটনার উত্থান পতনে বহু তথ্যেরও উদঘাটন করেছে, কখনো প্রায়োগিক কৌশলে, আবার কখনো বাস্তবের পটভূমিতে পা রেখে।

প্রসঙ্গক্রমে বনফুলের 'হাঁস' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফেরার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী হয় এক তরুণ। কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল ভিন্ন। যদিও পরিস্থিতির কথা ভেবে তিনি ছেলের ইচ্ছেকেই গুরুত্ব দেন ও একটি বন্দুক কিনে দিয়ে তাঁকে প্রস্তুতি শুরু করতে বলেন। এরপর এই তরুণ নিয়মিত শিকারে যাওয়া শুরু করে। একদিন শিকারে গিয়ে সে সরোবরে ভাসমান একটি সাদা হাঁসকে গুলি করে ও আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। হাঁসটিকে একটি ঘরে বন্দী করে সে অন্য কাজে মন দেয়। এরপর রাত বাড়লে দেখে বন্দী হাঁসটি ঘরের মধ্যে নেই। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করার পর তার নজরে পড়ে বাড়িতে সরস্বতীর যে পটচিত্রটি ছিল সেখান থেকেও বাহন হাঁসটি উধাও হয়ে গেছে। গল্পের পরবর্তী অংশটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে দেখানো হয়েছে অন্য একটি বিষয়। আসামে নিরীহ ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর সেনা বাহিনীর গুলি চালানোর ঘটনা। তাতে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই গল্পের রূপক। হাঁসটি যেন এসব নিরীহ মানুষের প্রতিনিধি। এভাবে ইঙ্গিত পেয়ে প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে ওঠে তরুণটি এবং সাথে সাথে সে বন্দুক ধরা ত্যাগ করে ও সরস্বতীর সাধনায় মগ্ন হয়।

বনফুলের অন্য একটি গল্প 'দ্বিতীয় শালিকটি' পাখির নামেই নামকরণ করা হয়েছে। এখানে এক শালিক-এ মন্দ ও জোড়া শালিক-এ শুভ, এমন একটি প্রচলিত ধারণাকে বোঝানো হয়েছে। 'কাকের কাণ্ড'-তে অসময়ে কাকের ডাককে অশুভ বিবেচনা করা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাঁস' গল্পটি দুই বন্ধুর আলাপচালিতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। যদিও গল্পের পরিণতিটি বড়ই কদর্য, যার সঙ্গে যোগ রয়েছে পাখির। রাজশেখর বসুর 'লক্ষ্মীর বাহন' গল্পে মুচকুন্দ রায়ের বাড়িতে একটি প্যাঁচার আগমন ও প্রস্থানের সাথে ভালো-মন্দের হিসেব মেলানো হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প 'তাজমহল'-এও পাখির বর্ণনা রয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র বিমলা। তাঁর সখ পাখি পোষার। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও সে বাড়িতে হাজির করে চন্দনা পাখি। তাকে সন্তান স্নেহে পালনও করতে থাকে সে।

বনফুলের 'পাখিদের মধ্যে' গল্পটিতে দেখানো হয়েছে একটি কোকিল ছানার দুঃখ। ছানাটি তার বাবা কোকিলের কাছে উপেক্ষিত হচ্ছে এবং খাবার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাকের বাসায় জন্ম বলে বাবা কোকিল

খাবার দিচ্ছে না। এরপর সেখানে উড়ে আসে মা কাকটি। সে কোকিল ছানাটির মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার গুঁজে দেয় ও তার খিদে মেটায়। পাখিদের মাতৃস্নেহের এমন দৃষ্টান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুনির ডিম' গল্পটিও বেশ মজার। ছোট অপু-র এক অদ্ভুত ইচ্ছে হয়। সে পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চায়। আর এই ইচ্ছে থেকেই সে লুকিয়ে বাবার বই 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' টি পাঠ করে। বইটি থেকে জানতে পারে কিভাবে শকুনের ডিমে পারদ ভরে সেটি রোদে শুকিয়ে নিয়ে মুখে পুরলেই যেদিকে খুশি, যেমন খুশি উড়ে বেড়ানো যায় তার বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী ঘটনা বেশ রসালো।

বিভূতিভূষণের গল্পে কাক, শালিকের যেমন প্রচুর বর্ণনা রয়েছে, তেমনি তাদের উপস্থিতির নিরিখে ঘটনার গতিপথেও এসেছে নানান রূপান্তর। তাঁর 'ইছামতি' উপন্যাসে গাঙশালিক, বুনো শ্যামকুট, হাঁস, চিল, শকুনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা ইছামতির তীরে এসে শুধু বাসা'ই বাঁধে না, জড়িয়ে পড়ে ইছামতির দু'ই তীরে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনধারার সাথেও। এসব পাখি প্রকৃতি দেখে দেখেই বোধহয় লেখকের ভাবান্তর ঘটত। তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন লেখায় : 'জগতের অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে আমাদের সামনে — গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূণ্য। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়।' বাস্তবিকই, এমন অনুভূতির কথা খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে'-র কাহিনী, 'শুকসারী কথা'। তাঁর একাধিক গল্পে বাংলার পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে ধরা দিয়েছে শালিক, টিয়া বাবুই ইত্যাদি পাখি। তবে তাঁর পক্ষী ভালোবাসার সূচনা খুব ছোট বয়সে, যেখানে তিনি দেখেছিলেন গাছের ডাল থেকে একটি পাখির ছানা পড়ে যাওয়ার ঘটনা। ছানাটি মরে যেতেই তিনি ও তাঁর বন্ধুরা খুব কষ্ট পান ও ছানাটিকে নিয়ে কবিতাও লেখেন। তাঁর এই 'পাখির মৃত্যু ও প্রথম কবিতা' আজো আমাদের শৈশবের দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভাবনার বৈচিত্র্যে অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা'-র কথাও মনে রাখার মতো। সুবচনীয় খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে একরত্তি হৃদয় চলেছে আকাশচারী হয়ে। নিচে বিন্দুবৎ গ্রাম, নগর, মাঠ, পাথার। অবন ঠাকুরের গল্পে হৃদয় বুদ্ধদেব বসুর ছোট শিশুটির মতো স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণায় হতাশ নয়, বরং সে তার স্বপ্নের জগতে পৌঁছে যাওয়ার শিহরণে উদ্বেল। এভাবে সাহিত্যের এই বিচিত্র ব্যঞ্জনায় বারবার ধরা পড়েছে পাখি। ব্যক্ত হয়েছে তার বিচিত্র সব রূপ। তবে পাখি শুধু ছোটদের ভাবনাতেই নয়, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধরণের লেখাতেও ধরা পড়েছে এই গগনচারীর বিচিত্র রূপকল্প।

*****

বাঙালী কবিদের প্রসঙ্গ টানলেও দেখা মেলে বহু পাখির। রজনীকান্ত সেনের 'স্বাধীনতার সুখ' নামক ছড়া'তে বাবুই পাখি ও চড়ুই পাখির কথোপকথনের দৃশ্য রয়েছে। মুক্ত প্রাণের আহ্বানে সাড়া দিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাক্ষী মেনেছেন পাখিকে : 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে...', কিংবা 'পাখি আমার নীড়ের পাখি, অধীর হল...'। মনের গভীরে আসন পাতে পাখির উপস্থিতি নিয়ে কবির এই লাইন কটিও —

'তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর — 'পরে ক্ষণে ক্ষণে বসতো এসে কাক।

চড়ুই পাখির আনাগোনা মুখর কলভাষা
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।'

রবি ঠাকুরের এমনতর আরো অনেক লেখা রয়েছে যেখানে পাখির উপস্থিতি ভিন্ন মাত্রা যুগিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যায়। এভাবে পাখির কথা বলে তিনি বহু চিত্রকল্পের অবতারণা করেছেন —

'ম্যাপগুলো দেওয়ালেতে করে ঝটফট,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট...।'

বহু ক্ষেত্রে পাখির উপস্থিতির ফলে প্রকৃতির এক অনন্য রূপমাধুর্য্য ছায়া ফেলেছে পাঠকের মনে। তাই তাঁর রচনায় ঠাঁই পেয়েছে রংবেরঙের পাখি, তাদের সু অনুভূতি।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'এক গাঁয়ে' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতায় তিনি কত অপূর্বভাবেই আমাদের জাতীয় পাখিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

'আমরা দু'জন একটি গাঁয়ে থাকি,
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ,
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি,
তাহার গানের আমার নাচে বুক।'

ভালোবাসাময় আবেগের নিবিড়তম বন্ধন হয়ে এ কবিতাটি আজও কবিতাপ্রেমীদের মুখে মুখে। পূরবী কাব্যের অন্তর্গত শিলংয়ের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বুলবুলিকে নিয়ে লিখেছেন —

'বেশ আছি, এই বনে বনে যখন-তখন ফুল তুলি;
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিস দিয়ে যায় বুলবুলি।'

নজরুলের একটি কাব্যের নাম 'চক্রবাক' (চকাচকি বা চখা পাখি)। এ পাখির প্রেমদাম্পত্য অনন্য নজির সৃষ্টিকারী। এ প্রসঙ্গে বকের কথাটাও চলে আসে। বক সাধারণত একাএকা থাকে না। এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকতে ভালোবাসে। একটি মরে গেলে অন্যটি শোকে কাতর হয়ে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে ও বাসায় বসে বসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। সারসও বকেরই জাত। কবি বিনয় মজুমদার এই সারসের প্রসঙ্গ টেনেছেন তাঁর লেখায় —

'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতা 'বাংলাদেশ'। কবিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে পাখির বর্ণনা :

'... কোথায় ডাকে দোয়েল-শ্যামা
ফিঙে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে,
মরালী তার পাছে পাছে;
বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,

আমাদেরই বাংলা রে !...'

পাখি নিয়ে এমন চিত্রকল্প মন ভরিয়ে দেয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গ্রাম বাংলার উজ্জ্বল দৃশ্যাবলী। ভালোলাগার অমৃত ধারায় স্নাত হয় মনের অলিন্দগুলি।

অক্ষয় কুমার বড়াল-র 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় পাখির বর্ণনা বড়ই মনোরম :—

'চাতক কাতরে ডাকে চলে বক নদীতটে
ডাকে কুবো কুব কুব লুকায়ে কোথায়।'

গীতি কবির এহেন ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'দূরের পাল্লা' কবিতার এই লাইন কটি —

'চুপ চুপ ঐ ডুব দেয় পানকৌটি
দেয় ডুব টুপটুপ ঘোমটার বউ'টি।'

পাখির নাম জুড়ে ঘটনার গতি বাড়িয়েছেন কবি বুদ্ধদেব বসু'ও। তাঁর 'বাবার চিঠি'- কবিতাটি-তে একটি শিশুর মনোকষ্টের কথা বলা হয়েছে :

'আমি যদি হতেম পাখি, থাকত যদি ছোট দুটি পাখা
তোমার কাছে উড়ে যেতেম চলে...'

শিশুটি শুধু পাখি হতে চেয়েছে। তার উপলব্ধি, পাখি হতে পারলেই সে তার ছোট দুটি ডানা'য় ভর করে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবে তার বাবার কাছে। সাত সমুদ্র-তেরো নদী পেরিয়ে চলে যাবে অচিনপুরে যেখানে তার বাবা থাকে।

*****

পাখিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখেছেন রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কাছে পাখি প্রাণের দোসর। তাঁর অতি প্রিয় পাখি শঙ্খচিল। এছাড়াও প্রায় ৫০ রকমের পাখির সাথে তাঁর সখ্যতার কথাও জানিয়েছেন তিনি বিভিন্ন কবিতায়। তাঁর 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় চারটি পাখির বর্ণনা রয়েছে। কবিতার শুরুতেই এসে পড়েছে এইসব পাখিগুলি।

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে — এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় — হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।
হয়তো বা হাঁস হব — কিশোরীর — ঘুঙুর রহিবে লাল পায়'

জীবনানন্দের কবিতা পড়লে বোঝা যায় পাখিদের চালচলন ও প্রকৃতির কোলে তাঁদের সহজ সরল উপস্থিতির কথা। খড়হাঁস, পাতিহাঁস, চিল, পানকৌড়ি, প্যাঁচা, শালিক এমনকি দুরছাই করা কাকও যে আমাদের এতখানি কাছে আসতে পারে, ঘনিষ্ঠ হতে পারে তা তাঁর কবিতা না পড়লে বোঝা যেত না। এখানেই তিনি আলাদা। অন্য কবি লেখকরাও তাঁদের লেখায় পাখির নাম উল্লেখ করেছেন, তবে সেটা নিছকই বর্ণনার তাগিদে। একমাত্র

জীবনানন্দ দাশ'ই পাখিকে বেঁধেছেন আবেগের বন্ধনে। তার চালচলন থেকে শুরু করে প্রকৃতির কোলে নিঃশব্দ উপস্থিতি কবির চোখকে করেছে বিমোহিত, মনকে করেছে উতলা। এ এক অদ্ভুত অনুভব, অনন্য নস্টালজিয়া। যখন কবি ধানসিঁড়ি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শঙ্খচিল, হাঁস, দোয়েল পাখিদের দেখেন। তখন তাঁর বর্ণনার ধারায় হারিয়ে যেতে হয় আমাদেরও। সুদূরের পথে হারিয়ে যেতে যেতে খুঁজে নিতে পারি এক অননুভূত বিস্মরণকে।

জীবনানন্দ শালিকের বেশে এই বাংলায় জন্ম নিতে চেয়েছেন। আবার তাঁর কবিতায় পাখিই নায়ক, নায়িকা, পার্শ্বচরিত্র — যা আর কারোরই কাব্যে দেখা যায় না। তাই পাখি ছাড়া জীবনানন্দের সাহিত্য অচল। পাখিই তাঁর শান্তি ও সান্ত্বনা। ঘুঘুর ডাকে তিনি যেমন পেয়েছিলেন শান্তি-র সন্ধান, তেমনি পেঁচা-র আওয়াজে বিমর্ষতার সুর। তাঁর কাছে চিলের কান্না বিদীর্ণ বেদনার চেয়েও ভয়ংকর। আবার অসীম ভালোলাগার অনুভূতিতে পাখির নীড়ের মতো চোখ যার, সেই বনলতা সেন যেন আমাদের আবেগেরই মথিত বহিঃপ্রকাশ। জীবনানন্দের অন্যতম সেরা কবিতা 'পাখিরা'। এটি একটি নিছক কবিতা নয়। এটি জীবনের নানাবিধ উপলব্ধির জীবন্ত এক দলিল :

'ওই দিকে শোনা যার সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তার পরে চ'লে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে ওই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সবদিকে —
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময়?

সাগরের ওই পারে — আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এইসব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের'পর
নেমেছিল তারা তারপর,
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামি – সোনালি – শাদা – ফুটফুটে ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল —
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে।

কোথাও জীবন আছে, — জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে — সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়েছে;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্ এক ক্ষেতে;
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ — গভীর — গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।'

*****

'শুকসপ্ততি' একটি প্রাচীন গল্পের বই। এখানে সত্তরটি গল্প রয়েছে। মজার বিষয়, একটি টিয়াপাখি গল্পগুলি শোনাচ্ছে। বাংলার অনেক লোকসাহিত্য ও ছড়াও গড়ে উঠেছে পাখিকে ঘিরে। পাখি নিয়ে জগদানন্দ রায়ের একটি ছড়া বেশ মজাদার :

'পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠ না।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোটো না।'

পরিশেষে

পাখি নিয়ে মানুষের আবেগ ভালোবাসা ভালোলাগা সবই অটুট এখনো। কিন্তু তারপরেও কোথাও যেন খামতি থেকে যাচ্ছে। মনে কোনো উঁকি দিয়ে যাচ্ছে এক অনামী যন্ত্রণা। জীবনানন্দকে ধার করেই বলতে হয় :

'কোথায় গিয়েছে আজ সেইসব পাখি, ...
.....
বাবলা ফুলের গন্ধে, সোনালি রোদের রঙে ওড়া
সেইসব পাখি, ...

চ'লে গেছে আমাদের এ — পৃথিবী ছেড়ে;
হৃদয়, কোথায় বলো — কোথায় গিয়েছে আর সব!
অন্ধকারঃ মৃত নাসপাতিটির মতন নীরব।'

তথ্যসূত্র :

[1] Wikipedia

[2] Birds in Literature : Leonard Lutwack

[3] Birds in Sanskrit Literature : K N Dave

[4] বাংলার পাখপাখালি : কণাদ বৈদ্য, সন্দীপ দাস, শান্তনু প্রসাদ, খৌনিশ শংকর রায়

[5] বাংলার পাখি : অজয় হোম

[6] Birds in Literature : Churchill Abby

नारी : दशा और दिशा

Sanjoy Shah
SACT, Department of Hindi
Asutosh College
e-mail : sanjoy.shah@asutoshcollege.in

भगवान शंकर का अर्द्धनारीश्वर रूप नारी शक्ति का प्रतिपादक है। हिमालय पर्वत पर जीवन से निराश मनु में जीवनी-शक्ति का प्रचार कर श्रद्धा यह प्रमाण देती है कि नारी पुरूष के लिए उतप्रेरक है। पुरूष अपने जिस पौरुष शक्ति पर गर्व करता है, वह नारी के कारण ही संभव हुआ है। निःसंदेह वह आधी-आबादी है, किंतु समय के विसात पर नारी न तो अर्धांगिनी रही न ही उत्प्रेरक तथा आधी-आबादी ही। उसके लिए धरती पर अंतिम उपनिवेश विशेषण का प्रयोग होने लगा. वह आज भी आजादी के बाट जोह रही है। उसे यथास्थिति से बाहर निकालने के लिए कई आंदोलन चलाए गए हैं, परंतु बात जहां की तहां रह गई। हिंदी साहित्य के उत्तर आधुनिक काल में यह स्वर फिर से मुखरित हुआ है। इस दिशा में अपसंस्कृति के बाहक का दंश झेल रहे इलेक्ट्रानिक मीडिया के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। धारावाहिक का इसी से संबंधं है और नारियों का धारावाहिक से।

भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान प्रारंभ से अधुनातन काल तक मिला है - "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" (मनुस्मृति) का सत्योद्घोष तत्कालीन भारतीय समाज में आचरणीय एवं अनुकरणीय माना जाता था। यथासंभव सामाजिक व्यवस्था में आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टियों से उक्त अवधारणा की अत्यधिक महिमा थी। आज की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में जो विकृतियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में दृष्टिगोचर होती हैं, उनका प्रधान कारण यह है कि हमने नार्यस्तु पूज्यन्ते के विचार को ताख पर रख दिया।

हमारे शास्त्रों में नारी के पतिवर्तय की बड़ी महिमा मानी गई है जिसमें अनुसूया, सावित्री, सीता, दमयन्ती आदि का परम कमनीय और वंदनीय उल्लेख मिलता है। माता को प्रथम गुरु का स्थान भी प्राप्त है। वही पहले अपने संतान को जगत का व्यावहारिक ज्ञान देकर उसे मानवोचित कर्म, स्वभाव, व्यवहार इत्यादि गुणों से युक्त करती है। इसेक पश्चात ही अग्रतर शिक्षा के लिए बच्चे गुरूकुल जाते हैं। जहां उनके समुचित भरण-पोषण, स्वास्थ्य आदि की देखरेख का दायित्व गुरू माताओं पर ही होता था। गुरूमाताएं गुरू के समान ही पूज्या थीं। हमारे शास्त्रों में देवताओं का स्मरण करते समय उनकी पत्नियों का नाम पहले लिया जाता है - गौरी-शंकर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि इसी तथ्य का द्योतक है। वाल्मीकि रामायण, कालीदास कृत रघुवंशम, विक्रमोर्वशी, कुमार सम्भवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि ग्रंथों में तत्कालीन नारियों की अवस्था का जो वर्णन किया है, उसमें नारियों को ही गरिमा मंडित किया गया है। साथ ही नारियों के विविध चरित्रों पर अच्छा प्रकाश भी डाला गया है। वहीं दूसरी तरफ आदिकाल में नारी को तत्कालीन परिवेश के अनुरूप ही दिखाया गया है। आदिकालीन राजनैतिक परिवेश में युद्ध का वातावरण अधिक रहा, अतः नारी भोग एवं उसके सुंदर रूप के कारण भी युद्ध हो जाते थे। भोग-विलासी, कामुक राजाओं के लिए उस समय यह उक्ति सटीक रूप से चरितार्थ होती थी - "जिहि की बिटिया सुंदर देखी, तेहि घर जाय धरे हथियार।" अतः आदिकाल में वीरता का एक मुख्य

प्रेरक नारी सौंदर्य ही रहा है। इसी प्रकार तत्कालीन-सामाजिक परिवेश पर उक्त राजनैतिक परिवेश के कारण समाज में नारी की स्थिति सम्मानजनक नहीं थी। नारी भोग्यामात्र रह गई थी। वह क्रय-विक्रयं एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी - ''सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोइ व्यवस्था नहीं थी, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्रो का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों व पुरुषों के लिए अप्राप्य बना दिया गया था। सती-प्रथा भी उस समय के समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप थी। फलतः सामान्य जाति की नारी के लिए पुरूष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना बन गई थी''[1] इस प्रकार हम देखते हैं कि ततकालीन परिवेश में नारी की स्थिति संत्रोषप्रद नहीं रही।

भक्तिकाल में जहां तक नारियों की स्थिति का प्रश्न है तो भक्ति काल में भी नारी घोर उपेक्षा की पात्र रही है। भक्तिकाल में भी स्त्री के मांसल सौदर्य के प्रति घोर आसक्ति ही रही, जिसमें पुरूष नारी के तन को देखने में ही अभ्यास्त रहा। पंडित परशुराम चतुर्वेदी का कथन है - ''यहां तक समाज में नारियों के स्थान के विषय में कहा जा सकता है, वह स्थान स्पृहणीय नहीं था। ये उसके पहले से ही पुरूषों के अपेक्षा कहीं अधिक नीचे स्तर की समझी जाती रहीं और उन्हें प्रायः हाशिए जैसा ही स्थान प्राप्त रहा। ... उस काल में स्त्रियों में पर्दा प्रथाके कारण उनहें अनेक प्रकार की दुखद असुविधाओं का भी सामाना करना पड़ जाता थघ।''[2]

भक्तिकाल के सगुण धारा के प्रमुख रामाभक्त कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नारी के अनेक रूपों का ललित ललाम वर्णन किया है - ''सीता तुलसीदास की ऐसी अनुपम सर्जना है, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्त्रीत्व के आदर्श की प्राण-प्रतिष्ठा की है। वहीं मानस के मूल में तुलसी ने पार्वती को रखा है। संपूर्ण कथा शिव-पार्वती संवाद के रूप में है। पार्वती के दो जन्मों की कथा मानस में अंकित हुई है। एक, संश्यात्मक सती के रूप में तथा दूसरे, पर्वतराज की कन्या गौरी के रूप में। भारतीय नारी की मर्यादा का ऐसा सुंदर सांस्कृतिक चित्रण अन्यत्र अनुपलब्ध है।''[3] बड़े रचनाकार के अंतर्विरोध भी बड़े होते हैं। एक तरफ तो तुलसीदास सीता, पार्वती जैसी स्त्रियों के माध्यम से आदर्श स्थापित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ''ढोल गवाँर शुद्र पशु नारी''[4] कहकर नारी को निंदक, पथभ्रषटक भी सिद्ध कर तेदे हैं।

ठीक तुलसी के समान ही संत साहित्य के कवि भी एक ओर कामिनी रूपी नारी की कटु निंदा करते हैं तो दूसरी ओर उन्होंने नारी की प्रशंसा भी की है। संपूर्ण संत साहित्य में पतिव्रता, सुहागन, सती और माता रूपी नारी की पूरजोर शब्दों में प्रशंसा की गई है। संत काव्य के शिरोमणि कवि एवं घोर नारी निंदक, कबीर जिन्होंने ''नारी सेती नेह, बृधि विवेक सभी हरै।''[5] कहकर कामिनी को विष की बेल कहा, नारी को मानो विनाश का कारण बताया। वहीं दूसरी तरफ पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा करते हुए कबीर कहते हैं, 'निःसंदेह' वह नारी सम्मानीय है जो पति के प्रति एकांतिक रूप से समर्पित होकर एकनिष्ठ भाव से पतिव्रत्य का पालन करती है -

''सोइ तिरिया जाके पतिव्रता आग्योकार न लोपै।
और सकल ए कूकरि सूकरि सुन्दरि नाउं न ओपै।''[6]

रीतिकाल में नारियों की स्थिति सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से घोर अधःपतन का था। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतशाही के दोष का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा था। समाज में नारी की स्थिति सोचनीय थी। डॉ. महेन्द्र कुमार के अनुसार, नारी को अपना सम्पत्ति मानकर ही उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। विलास के उपकरणों की खोज और उनका संग्रह तथा सूरा-

सुंदरी की आराधना अभिजात्य वर्ग का शोक था। किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्ग के लोकों के लिए साधारण बात थी। कदाचित इसीलिए अल्पायु में लड़कियों का विवाह अधिक प्रचलित हो गया था।''[7] इसी समय रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बिहारी का आविर्भाव हुआ। इस समय काव्य जगत में शृंगार और प्रेम चित्रण की प्रर्वत्ति को प्रमुखता प्राप्त हो चुकी थी. बिहारी के काव्य में भी अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति आश्रयदाताओं, राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने हेतु शृंगार प्रधान रचनाएं ही हुई। बिहारी सतसई में मध्यवर्गीय परिवारों के जीवंत चित्र उपलब्ध हैं। स्त्रियां आर्यधर्म के नियमों और विविध रूढ़ियों में जकड़ी हुई थी। उन्हें उन्मुक्त प्रेम का अवसर प्राप्त नहीं था. ज्यादातर परिवार संयुक्त थे। नारी और पुरुष दोनों ही परकीया संबंध की ओर आकृष्ट होते हैं। नारी सौंदर्य की मादकता संयोग और वियोग दोनों रूपों में चरम पर था। नायिका के अंग-अंग की ज्योति नायक को आंदोलित और उन्मादित करते ही। जैसे -

''मुँह धावति एड़ी घमति हँसति अनंगवती तड्डर।
धँसती न इनदीवर नयनि कालिंदी के नीर।''

रीतिकाल के समाप्ति के बाद 19वीं शताब्दी के बाद नारी समाज में नवजागरण का दूत बनकर आया। तत्पश्चात आधुनिकता की झलक हमारे भारतीय जीवन पर भी उभरने लगी। नारी की हीन अवस्था को सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने लगे और समूचा युग नारी सुधार से गूंज उठा। इस काल की समाज सुधारक संस्था रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्यसमाज तथा थियोसोफिकल सोसाइटी आदि ने नारी सुधार संबंधी कार्य किए। नारी अब पुरूष के सहयोग की आकांशणी बनी। परिवार की संकीर्णताओं से निकलकर वह सामाजिक बन गई। अब यह स्पष्ट होने लगा कि आधुनिकता तथा भारतीय जागरण का सीमा क्षेत्र शिक्षित नारियों से है क्योंकि ''स्त्री शिक्षा का अभाव ही कहा जा सकता है। इसलिए यदि भातृभूमि तथा मातृभाषा की उन्नति करनी है तो पुरूषों का कर्तव्य है कि स्त्रियों को उचित शिक्षा दैं। जब तक भारत की ललनाएं ऐसे ही कूपमंडूक बनी रहेंगी, उन्नति होना असंभव है।''[8]

आधुनिक काल में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिला जो काफी संतोषप्रद है। वे केवल अब पति पर ही आश्रित नहीं हैं, वे आज स्वयं भी जीविकोपार्जन कर रही हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय करती हुई नजर आ रही हैं जैसे वकीज, डॉक्टर, प्रोफेसर, एकाउंटेंट, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, नर्स, पुलिस अधिकारी, फैक्टरी में मैनेजर, जज, पर्वतारोहिणी तथा हवाई जहाज का चालक आदि। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में नारी की स्थिति में सुधार काफी हुआ किंतु आज भी गांव और नगरों में अनेक रूढ़िवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि भारत की सभी स्त्री मुक्त होकर सम्मानपूर्वक जीये तो हमें शिक्षा का अलख जगाना होगा क्योंकि नारी की समस्याओं का समाधान इसी से संभव है। हमें पुरुषोचित मानसिकता को त्यागते हुए स्वस्थ्य मानसिकता को अपनाना होगा। हमें यह मानना होगा कि स्त्री और पुरुष प्रकृति प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इनमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। स्त्री और पुरुष के परस्पर सहयोग से ही इस धरा का विकास संभव है। अब ''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी।'' की जगह निम्नलिखित पंक्तियों को जीवन में डालने की आवश्यकता है -

न तू अबला, न तू सबला, बस तुम नारी हो,
अखंड विश्वास से बंधी हुई तुम, बड़ी ही प्यारी हो।

संदर्भ सूची

[1] नगेन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-56

[2] नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, चतुर्थ खंड, पृष्ठ-65

[3] शर्मा रामानंद, मानस की महिलाएं, पृष्ठ-72

[4] शर्मा रामानंद, सुंदरकांड, 48/3

[5] सिंह जयदेव एवं सिंह वासुदेव, कबीर वाड. मय, खंड-3, पृष्ठ-172

[6] दास, श्यामसुंदर, कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ-102

[7] नगेन्द्र (सं.), हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-297

[8] हिंदी साहित्य सम्मेलन, लाहौर, पृष्ठ-12

ROMANTIC LOVE AND CAPITALISM: A GOOD MATCH IN LATE-MODERNITY AS DEBUNKED BY EVA ILLOUZ

Soumen Das

Assistant Professor, Department of Sociology
Asutosh College
e-mail : sdas.socio@gmail.com

Abstract: Sociology of intimate life is a crucial area of investigation for sociologists since its inception. Eva Illouz, Professor in sociology of Jerusalem University, has contributed immensely in this field. Her works primarily reflected on the profound transformation of intimate private relationships in 20th century. She established an intricate relationship between romantic love and capitalism in late-modern societies. The key point of her work is that the commercialization of romantic contexts neither harms subjectivity nor results in social pathologies, rather the widespread consumption of amorous rituals constitutes the core of contemporary romantic love, reinvigorating capitalism and lovers alike. Professor Illouz ultimately claims that capitalist market and romantic love have no contradiction, but rather a perfect symbiosis.

Keywords*: romantic love, sexualization, individualization, detraditionalization and capitalism.*

Sociologist **Eva Illouz** of Jerusalem University has recently given us an outstanding reflection on the transformations of romantic love in 20th century in her book Consuming the Romantic Utopia, first published in 1997. The said book received the American Sociological Association's Outstanding Contribution award in 2003. In her book Illouz (2003) claimed that romantic love and capitalism make a good match in late-modernity. The key point of her thesis is that the commercialization of romantic contexts neither harms subjectivity nor results in social pathologies, rather the widespread consumption of amorous rituals constitutes the core of contemporary romantic love, reinvigorating capitalism and lovers alike (Costa; 2005). Aiming to promote dialogue between cultural studies and the critical tradition, Illouz recovers the various connections between the capitalist market and romantic love and claims that there is no contradiction between them, but rather a perfect symbiosis (ibid). She identifies at least three major interfaces that ensure the convergence between the production and circulation of goods and services and romantic love in late-modernity. The **first** connection is established by the creation and diffusion of cultural meanings associated with romantic love. A person feels excited when attracted to someone by decoding love based on the available cultural repertoire (a network of values and meanings) developed through a collection of images, products, books, works of art etc.

This repertoire allows us to recognize, interpret and evaluate the essence and intensity of our feelings for another person. At the first half of 20th century, literary compositions were responsible for furnishing lovers with their models of communication and expected behaviour, but this role is fulfilled in late-modernity by the culture industry and advertising (Illouz; 2003). The **second** intersection between the market and love lies in the development of a public space in which the amorous plot could unfold (ibid). This space comes in the form of the institution of 'dating' in the new commercial settings of leisure: the darkness of a movie theatre, a bar, over a candlelit dinner, etc. The **third** point of interface between economic calculation and romantic love lies within the scope of love-related choices (Costa; 2005).Despite the idea that love goes beyond any social or physical boundaries, statistics show, according Illouz (2003), that having similar cultural capital is the key of an amorous commitment. Therefore, romantic love is socially endogamic.

Among these three above mentioned interfaces, Illouz paid most of her attention on the last type, that is, the very conditions within which romantic choices are made. According to her (2012:9), in the second half of twentieth century heterosexual romantic love has experiences two most important cultural revolutions: 1. The individualization of lifestyles and the intensification of emotional life projects; and 2. The economization of social relationships. To understand the transformations of romantic love relationships based on these two cultural revolutions in late-modernity, the notion of 'choice' might be the best analytical category, as Illouz states. It is because choice is the defining cultural hallmark of modernity as it embodies the exercise not only of freedom, but also of two faculties that justify the exercise of freedom, namely rationality and autonomy (Illouz; 2012: 19). Illouz (2012) identified two kinds of conditions within which transformations of romantic choices have taken place: The ecology and the architecture of choice. Romantic search or the choice of a partner has become a highly complex sociological endeavour as a result of the intense sexualisation of romantic relations, the individualization and complexification of the search process, the rise of marriage market that leads to competitiveness of the pairing process and transformation of sexuality into (erotic) capital via sexual experience and success (ibid: 57). The eroticization of romantic relations is associated with the disappearance of formal mechanisms of endogamy and the deregulation of romantic love relations under the banner of individualizations. By individualization, Illouz (2012: 51) mean that "individuals, not families, become carriers of personal, physical, emotional, and sexual attributes that are supposed to constitute and define their particularity and uniqueness and that individuals take charge of the process of evaluating and choosing". She further added that sexual attractiveness has become an autonomous dimension of pairing in modernity (2012: 54). It has been shaped by the media-fashion-cosmetics industries as they received the endorsement of the cultural industries of movies, modelling and advertisement. This standardization of beauty and sexiness in turn has led to a kind of social hierarchy: some

people are clearly sexually more attractive than others according to cultural codes (2012: 50). These changes set up the conditions for the emergence of '**marriage market**'. Therefore, marriage market emerges only in the conditions of modernity. The most immediate and lasting consequence of the emergence of marriage markets is that race, socio-economic status, and religion are no longer formal obstacles to the choice of a mate (Illouz: 2007). It becomes open to everyone and a matter of personal taste. It is at the same time economic and emotional, rational and irrational (Illouz; 2012: 53). People make their choices in which economic calculus is harmoniously reconciled with emotions, but sometimes it is subject to internal tensions between a "socially appropriate" and a "sexy" person. This is why the sexual romantic **habitus** has become a very complicated issues as it contains a variety of dispositions (ibid: 53). Romantic search, for Illouz, therefore, has become objectively a very complex phenomenon. It is split into recreational sexual practice at one hand and on the other hand a search for mate with emotional commitment. That is, when we select our mate for love and commitment, we do that on the basis of equal social status, class etc., but mate selection also happens in the context of recreational sexuality based on classless experience of shared pleasure and pure sexuality (2012: 58).

However, the deregulation of match making process and the valorisation of sexual attractiveness have given rise to what Illouz paraphrasing Bourdieu calls **sexual fields**. She (ibid: 54) defines it as " social arenas in which sexual desire is autonomized, sexual competition is generalized, sexual appeal is made into an autonomous criterion for selection of a mate, and sexual attractiveness is made into an independent criterion by which to classify and hierarchize people". The process of hierarchization of people in sexual field is at the heart of what sociologist Hans Zetterberg has called "erotic ranking". Following field analysis, Illouz (ibid: 55) notes that some people are more successful than others at defining who an attractive desirable mate is, and that relatively few members are at the top of the sexual pyramid, that they are the object of competition by a larger number of people than others are. The rise of this new sexual field has led to a new form of domination of women by men. Because, in pre-modern patriarchal societies men wanted to enter matrimony as they could have control over children, women and servants. But, by contrast, in modern capitalist societies property and flows of capital are controlled by men. Therefore, marriage making and love become crucial to women's social and economic survival (ibid: 55) and for men (particularly middle and upper middle class men) it becomes an option (ibid: 243). This greater availability of choice makes men dominate the sexual field as manifested in their greater reluctance to enter long-lasting binds or what Illouz calls 'commitment phobia' created by the new ecology and architecture of choice.

References :

[1] Costa, Sergio. (2005). "Easy Loving: Romanticism and consumerism in late modernity". *Novos Estudos CEBRAP*. Vol-1. No. 73. p. 111-124. (Translated by Anthony Doyle).

[2] Illouz, Eva. (2003). *Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradiction of Capitalism*. Berkeley: University of California Press.

[3] Illouz, Eva. (2007). *Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

[4] Illouz, Eva. (2012). *Why Love Hurts*. Cambridge: Polity Press.

IS DEEP FRYING IN COOKING OIL SAFE? THINK BEFORE YOU EAT

Dr. Keya Ghosh[1] & Subhodeep Sarkar[2]

[1] Associate Professor, Depatment of Chemistry
[2] Former Student, Department of Environmental Science (PG)
Asutosh College
* e-mail : keya.ghosh@asutoshcollege.in

Abstract : Deep frying is one of the most popular means for preparing food. It is known that fats and oils, when subjected to prolonged heating for frying, undergo a series of chemical-physical modifications, the effects of which can be observed in the variation of the sensory and nutritional characteristics. Oxidation plays a significant role in the development of rancid flavours that reduce the oil's natural characteristics, and the formation of oxidized products that may cause a health hazard. Highly oxidized oils may also produce polyaromatic hydrocarbons that are thought to have a carcinogenic effect. The main objective of the present study is to investigate the effects of deep frying in cooking oil and related effects on human health. The frying experiment was conducted for five consecutive days. Six frying media were considered here: Palm oil, Soy oil, Mustard oil, Dalda and Palm oil from sweet shop and soy oil from fast food stall. The chemical analysis showed that there was a significant change of the Iodine value (IV), para- anisidine value (p-AV), Peroxide value (PV) and Total Oxidation Value (TOTOX value) for each frying oil during the four consecutive days of frying (day 0 to 4). Soy oil had the least stability in terms of deep-fat frying due to a high level of unsaturated fatty acids. Conversely, Dalda had the best stability due to the presence of high level of saturated fatty acid.

Key words: *Deep frying, rancid flavours, polyaromatic hydrocarbons, iodine value, para-anisidine value, peroxide value, TOTOX value.*

Highlights:

- Deep frying is one of the most commonly used means for preparing foods, although it is also one of the most complex and least understood process.
- Highly oxidized oils may cause some health hazard according to WHO.
- The main objective of the study was to investigate the effects of deep frying in cooking oil and related effects on human health.
- From the study, for the deep frying purpose the oils with high amount of saturated fatty acid are better than the oils with high poly unsaturation.

- Avoid the fried food from food stall/sweet shop/fast food corner.

Abbreviations:

TOTOX value (Total oxidation value), WHO (World Health Organization), AOCS (American Oil Chemists' Society), UBC (University of the Basque Country) in Spain, IV (Iodine Value), PV (Peroxide Value), p-AV (para- Anisidine Value), LD50 (Lethal Dose 50), SO (Soy oil), MO (Mustard oil), PO (Palm oil), VG (Dalda), FDA (Food and Drug Administration, SD (Standard Deviation).

1. Introduction.

Cooking oil is plant, animal or synthetic fat used in frying, baking and other type of cooking. Oils contain saturated fat and unsaturated fat which we require in our diet. They provide the most concentrated source of energy of any food stuff, supply essential fatty acids (which are precursor for important hormones, the prostaglandins). They are carriers for fat soluble vitamins and serve to make foods more palatable. FDA recommends that 30% or fewer of calories consumed daily should be from fat.

Most of the carboxylic acids of biological origin are found as esters of glycerol, that is, as triacylglycerol. Triacylglycerol are the oils of plants and the fats of animal origin. They include peanut oil, soybean oil, corn oil, sunflower oil, butter, lard and tallow. Generally oils are liquid and fats are solid at room temperature. Naturally occurring fatty acids contain two or more double bonds. The fats or oils that contain those fatty acids are called poly unsaturated fats. Common saturated fatty acids are C14 (myristic acid/tetradecanoic acid), C16(palmitic acid/hexadecanoic acid), C18(stearic acid/octadecanoic acid) and unsaturated fatty acids are C16 (palmitoleic acid/cis-9-hexadecanoic acid) C18 (oleic acid/cis-9-octadecanoic acid, linoleic acid/cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, linolenic acid/cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid) (Organic chemistry, 9th edition, G.B.Solomon).

Though there is a high correlation between high consumption of saturated fats and coronary heart disease, consumption of small amount of saturated fat is essential for every person (Robert Clarke et al 1997, Mensinket al 2003.). According to Mayo clinic, oils those have lower amounts of saturated fats and higher levels of unsaturated fats like olive oil, avocado oil, peanut oil, canola oil, safflower oil, sunflower oil, soy oil, mustard oil and cottonseed oils are generally healthier. Not all saturated fats have negative impact on cholesterol. Palmitic acid in palm oil does not behave like other saturated fats, and is neutral on cholesterol levels because it is equally distributed among three arms of triglyceride molecule (Tony Ng Kock Wai,1993-1994) but according to researchers an adequate intake of both poly unsaturated and saturated fats are needed for the ideal LDL/HDL ratio in blood, as both contribute to the regulatory balance in lipoprotein metabolism (Hayes, Kenneth; Khosla, Pramod 2007).

Deep fried food is very popular nowadays and many health issues associated with the quality of the oil used for frying have been raised. The oil, as well as the food, undergoes severe changes due to the high temperature used in the process. Derived compounds are formed during frying resulting from the oil or fat at high temperature, around 180ºC, in the presence of air and moisture (Professor Carmen Dobarganes, AOCS lipid library). Oils are degraded to form volatile and non volatile decomposition product during frying (Melton et al., 1994). The chemical changes in frying oil also result in changes in the quality of fried food. The fatty acid composition of the frying oil is an important factor affecting fried food and its stability; the oils containing unsaturated fatty acids readily undergoes thermal oxidation due to the presence of double bond (C=C), therefore, it should have low level of polyunsaturated fatty acid such as linoleic or linolenic acids and high level of oleic acid with moderate amounts of saturated fatty acid (Kiatsrichart*et al.,* 2003; Mehta and Swinbum, 2001). Oxidation of unsaturated lipids not only produces offensive odors and flavors but can also decrease the nutritional quality and safety by the formation of secondary reaction products in foods after cooking and processing. Decomposition products are also formed as a result of reactions between food ingredients and oil affecting product's taste, flavour and shelf-life (Dobarganes et al., 2000). Oxidation of the unsaturated fatty acids starts via a free-radical reaction, producing hydroperoxides (RO2H), which are the primary oxidation products as shown in the figure below.

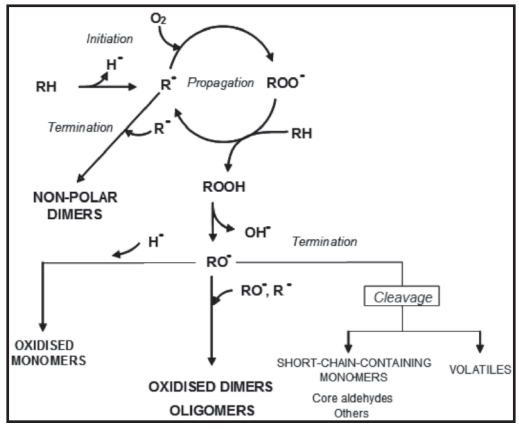

Figure 1 Thermal oxidation of oil (AOCS[1] lipid library)

The hydroperoxides are very unstable and quickly decompose via C-C bond fission to form secondary oxidation products, such as aldehydes, alcohols or hydrocarbons. Trans-**fatty acids** and a substance called acrylamide are also produced (Abdulkarim S. M. *et al.2007).*These compounds are of great concern and they can promote further degradation and can be accumulated by the fried food, thus they may cause great concern to human

[1] AOCS = American Oil Chemists' Society (AOCS)

health. According to WHO[2], highly oxidized oils may also produce polyaromatic hydrocarbons that are thought to have a carcinogenic effect.

Are repeatedly-used deep-frying oils safe?

This is the question which is largely unanswered by the global scientific community. Deep fried foods are high in calories which may increase the risk of gaining weight. This is the main reason behind hypertension. Hypertension is strongly associated with obesity. Polyunsaturated oils like soya, canola, sunflower, and corn oil degrade easily to toxic compounds when heated. Prolonged consumption of burnt oils led to atherosclerosis, inflammatory joint disease, and development of birth defects (Grootveld, Martin et al.2001).

María Dolores Guillén, a lecturer in the Pharmacy and Food Technology Department at the UBC[3], confirms the simultaneous presence of various toxic aldehydes from the 'oxygenate, β-unsaturated group' such as 4-hydroxy-[E]-2nonenal. Furthermore, two have been traced in foods for the first time (4-oxo-[E]-2-decenal and 4-oxo-[E]-2-undecenal).Until now these substances had only been seen in bio-medical studies, where their presence in organisms is linked to different types of cancer and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's.

All these facts prompted us to carry out this project on the study of quality of burnt cooking oil causing decrease in the proportion of unsaturated fats with the generation of toxicity by oxidative degradation.

2. Materials and methods.

2.1 Materials:

Fresh oils mustard oil (MO), soy oil (SO), palm oil (PO) and dalda (VG) were purchased from market and burnt oils soy oil and palm oil were collected from fast food stall and sweet shop respectively. Glacial acetic acid, chloroform, Wij's solution, para-anisidine, sodium thiosulphate, potassium dichromate, 10%potassium iodide solution and 1% starch were used in the experiment.

2.2 Frying process:

Laboratory scale frying test was carried out initially on four commercial oils namely; palm oil (PO), soy oil (SO), mustard oil (MO) and dalda (VG). 65ml of oils were taken in a round bottle flask. Oils were heated at 180^0-200^0c in reflux condenser for approximately 2 hours for five days.

---

[2] WHO = World Health Organization.

[3] UBC = *University of the Basque Country* (UBC) in Spain

2.3 Sampling of oil for analysis:

In this study, 10 ml - 15 ml of burnt oils were collected each day after frying, in small reagent bottle for analysis in the next day. All samples were stored at 4^0C.Each day fresh oils were added to make up oils to the initial level in the round bottle flask to replenish the used oil before frying commenced (Warner & Knowlton, 1997; Petukhov et al., 1999). Similarly the collected fried oil from sweet shop/fast food stall were also stored at the above mentioned temperature. Five samples of oil were collected each at day 0, day 1, day 2, day 3 and day 4. Day 0 oils were fresh oils collected from oil market and from sweet shops/fast food stalls before the start of the frying. All the oil samples collected were analyzed using the same procedure.

2.4 Methods:

a. Iodine value analysis:

The analysis is an example of iodometry. In a typical procedure, the fatty acid is treated with an excess of the Hanuš or Wijs solutions, which are, respectively, solutions of iodine monobromide (IBr) and iodine monochloride (ICl) in glacial acetic acid. Unreacted iodine monobromide (or monochloride) is then allowed to react with potassium iodide, converting it to iodine, whose concentration can be determined by titration with sodium thiosulfate.The chemical reaction associated with this method of analysis involves formation of the di iodo alkane. The iodine value (IV) of frying oil was determined according to the standard methods mentioned in Food safety and standards authority of India ministry of health and family welfare government of India New Delhi 2012.

b. Peroxide value analysis:

Peroxides are the main initial products of autoxidation. The classical method for quantitation of hydroperoxides is the determination of peroxide value (PV). The hydroperoxide content, generally referred to as PV, is determined by aiodometric method. This is based on the reduction of the hydroperoxide group (ROOH) with iodide ion (I^-).The amount of iodine (I_2) liberated is proportional to the concentration of peroxide present. Released I_2 is assessed by titration against a standardized solution of sodium thiosulfate ($Na_2S_2O_3$) using a starch indicator.The American Oil Chemists' Society (AOCS) method was followedhere to determine peroxide values of oils.

c. *Para-anisidine* value analysis:

para-anisidine (*p*-anisidine), a grey-brown solid, is the least toxic of the three isomers of anisidine (oral LD50[4] = 1,400 mg/kg) but still causes blood damage upon oral ingestion, inhalation or skin contact. If heated strongly, it may release very toxic fumes of nitrogen oxides. *p*-anisidine reacts with secondary oxidation products such as aldehydes and ketones

[4] LD50 = Lethal Dose 50.

in fats and oils to form products that absorb at 350 nm wavelength of light.The AOCS method was used to determine the p-anisidine value.

d. TOTOX value:

TOTOX (total oxidation value) is used to describe total oxidation to which oil has been exposed.

$$PV \times 2 + AV = TOTOX$$

3. Results and Discussion

3.1 Changes in iodine value (IV):

Table 1 shows the changes in IV of the oils during 4 consecutive days of frying. The IV indicates the degree of unsaturation of the oils. A decrease in IV can be attributed to the destruction of double bonds by oxidation and polymerization. Changes in IV over the 4 days frying period from the initial values for SO[5]; 127.51-114.75 was larger followed by that of MO[6]; 102.33-94.47. Lesser changes were found in PO[7]; 56.73-50.26 and VG[8]; 48.35-43.30.This meant that VG and PO were less susceptible to oxidation than SO and MO. In table 2 same results were obtained in case of SO from fast food stall and PO from sweet shop, change of iodine-value in case of former was greater than the later.

3.2 Changes in peroxide value (PV):

Table1 shows the changes in the PV of the oils from day 0 to 4. There was an initial sharp increase in the PV for SO from day 0 to day 1 after which the rate slows down and again increases, while PO, MO and VG showed a gradual increase throughout the frying time. Peak values for the PV (miliequivalent O_2/kg oil) were attained after day 4. Rapid increase in PV in SO showed the oil to be very unstable to oxidative degradation. This was largely due to the high amounts of unsaturated fatty acid in the oil. SO has the highest percentage of linoleic and linolenic acid and showed less stability to oxidation than the other oils.

Table 1: Change of Iodine value and Peroxide valueduring deep frying of cooking oils(in Lab).

	Days	MO	PO	SO	VG
IV (g I_2/100 g oil)	0	102.33±0.00	56.73±0.27	127.51±1.51	48.35±0.56
	1	100.87±1.10	55.14±0.28	123.99±1.43	46.87±0.00
	2	99.18±0.00	53.87±0.28	121.32±0.75	46.00±0.59
	3	96.66±0.00	51.94±0.28	118.00±1.56	44.68±0.00
	4	94.47±1.03	50.26±0.54	114.75±0.77	43.30±0.29

Values are expressed as mean±SD[9]. (n=2)

[5] SO = Soy oil. [6] MO = Mustard oil.
[7] PO = Palm oil. [8] VG = Dalda.
[9] SD = Standard Deviation.

	Days	MO	PO	SO	VG
PV, meqO_2/kg	0	2.038±0.18	0.00±0.00	1.482±0.00	2.964±0.00
	1	2.470±0.00	1.235±0.00	3.397±0.31	3.088±0.00
	2	3.672±0.00	3.978±0.31	2.754±0.31	3.213±0.47
	3	4.570±0.30	4.113±0.45	5.179±0.30	3.960±0.30
	4	5.459±0.00	4.549±0.30	6.369±0.30	4.852±0.00

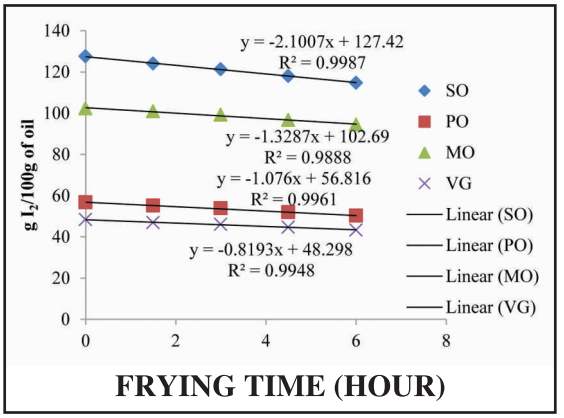

Figure 2: change of iodine value with frying time (Lab).

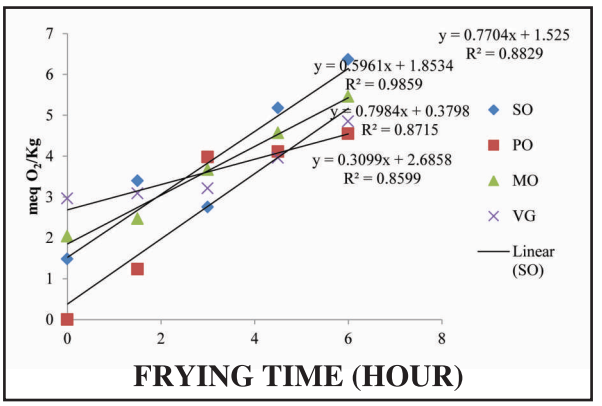

Figure 3:change of peroxide value with frying time (Lab).

Table 2: change of IV and PV of burnt oil collected from sweet shop and fast food stall.

	Days	Palm oil from sweet shop	Soy oil from fast food stall
IV(g I_2/100 g oil)	0	52.42±0.5	130.52±1.01
	1	49.14±0.37	123.56±0.75
	2	46.47±0.00	120.17±1.48
	3	45.13±0.56	119.54±1.40
	4	42.89±0.27	115.89±0.64

	Days	Palm oil from sweet shop	Soy oil from fast food stall
PV, meqO_2/kg	0	1.511±0.00	0.944±0.19
	1	2.632±0.00	2.068±0.19
	2	3.384±0.00	4.136±0.00
	3	5.801±0.19	7.860±0.37
	4	8.901±0.00	11.126±0.00

Values are expressed as mean±SD. (n=2)

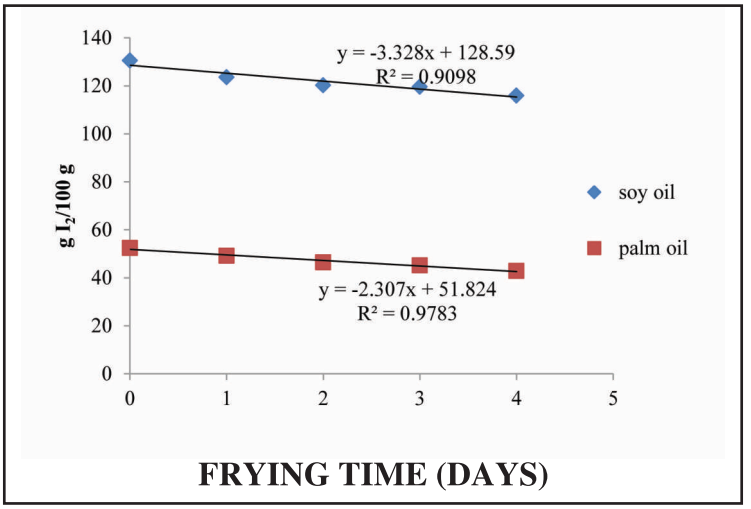

Figure 4: change of iodine value with frying time(Sweet shop and fast food stall).

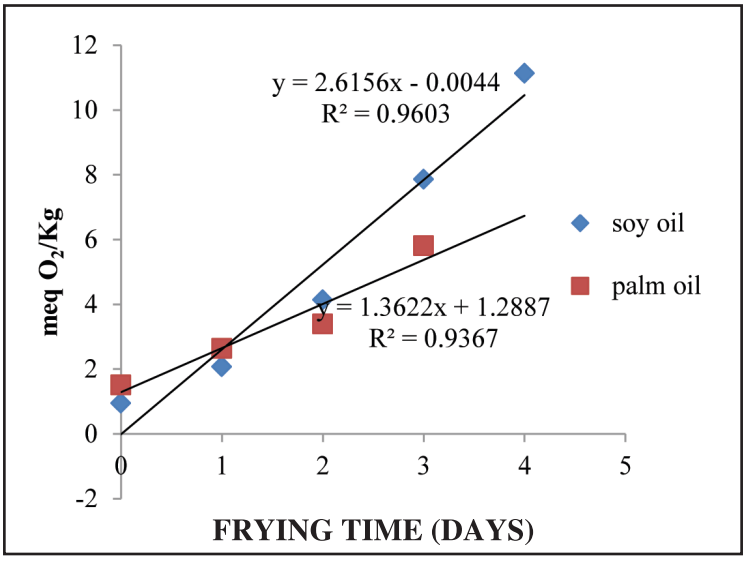

Figure 5: change of peroxide value with frying time(Sweet shop and fast food stall).

3.3 Changes in p-anisidine value (p-AV):

It determines the amounts of aldehyde (principally 2-alkenals and 2,4-alkadienals) in animal fats and vegetable oils. The method is used in combination with peroxide value to assess the extent of oxidative rancidity. Table 3 and 4 shows the changes in the p-AV of the oils from day 0 to 4. There was an increase in the p-AV in all the oils with increasing frying time. This happened because the less stable primary oxidative products (hydroperoxides) decompose further to form aldehydic compounds. The change in p-AV of VG and PO were found to be lower than the rest of the oils tested, with the highest values obtained in SO and MO. This confirms the results of the PV that showed the two oils to be more susceptible to oxidation at high temperatures than VG and PO. In case of oils, collected from sweet shop and fast food stall the p-anisidine values were very high.

3.4 Determination of total oxidation (TOTOX *value):*

p-AV is often used in the industry in conjunction with PV to calculate the so-called total oxidation or TOTOX value given as: TOTOX = 2PV + p-AV (Shahidi&Wanasundara, 2002). The results of this analysis are shown in Table 3. After the fourth day of frying, the TOTOX value of VG (40.764) was found to be lower than PO (45.658), SO (68.478) and MO (54.948). The lower TOTOX value of VG shows that the oil is more stable to oxidative rancidity than the rest of the oils used. The higher TOTOX value of SO was due to the high percentages of polyunsaturated fatty acids present in the oil. It contains high amounts of linoleic and linolenic acids. In contrast MO contained high amounts of monounsaturated (oleic) acid, while PO contained high amounts of saturated (palmitic) and monounsaturated (oleic) acids. This gives the latter oils their oxidative stability more than the SO. In table 4 TOTOX values of PO collected from sweet shop and SO collected from fast food shop were very high than the values obtained under the lab experiment.

Table 3: changes of P-AV and TOTOX value during deep frying of oil in lab.

	Days	MO	PO	SO	VG
p-AV	0	4.46±0.17	1.47±0.22	2.92±0.12	5.09±0.54
	1	6.40±0.17	6.63±0.26	7.78±0.33	7.19±0.31
	2	15.47±0.56	11.21±0.02	14.98±0.56	12.81±0.17
	3	29.05±0.20	25.53±0.87	39.48±0.55	22.33±0.20
	4	44.03±0.77	36.56±0.31	55.74±0.36	31.06±0.77
TOTOX value (2PV + p-AV)	0	8.536±0.53	1.47±0.22	5.884±0.12	11.018±0.54
	1	11.34±0.17	9.10±0.26	14.574±0.95	13.366±0.31
	2	22.814±0.56	19.166±0.64	20.488±1.74	19.236±1.11
	3	38.19±0.80	33.756±1.77	49.838±1.15	30.25±0.80
	4	54.948±0.77	45.658±0.91	68.478±0.96	40.764±0.77

Values are expressed as mean±SD. (n=2).

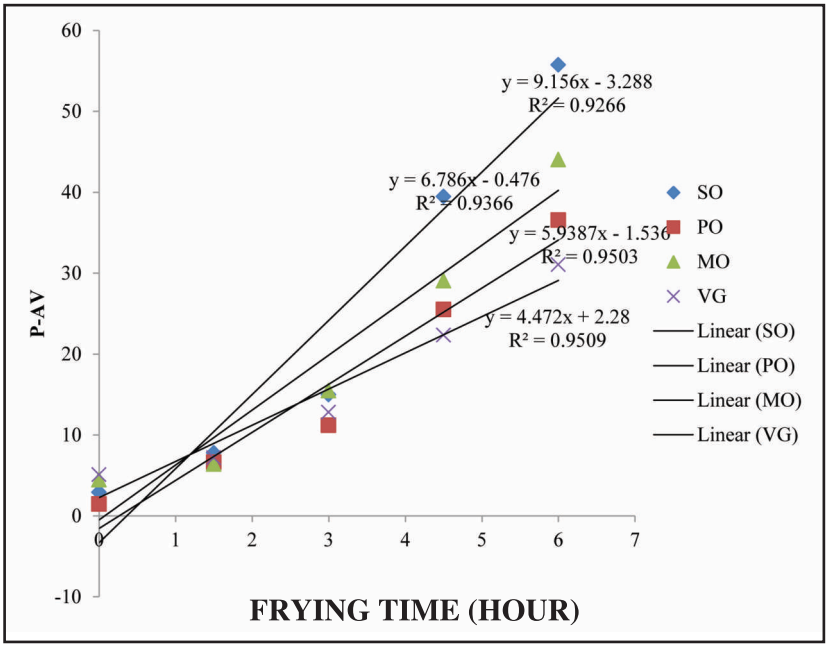

Figure 6: change of para - anisidine value with frying time (lab).

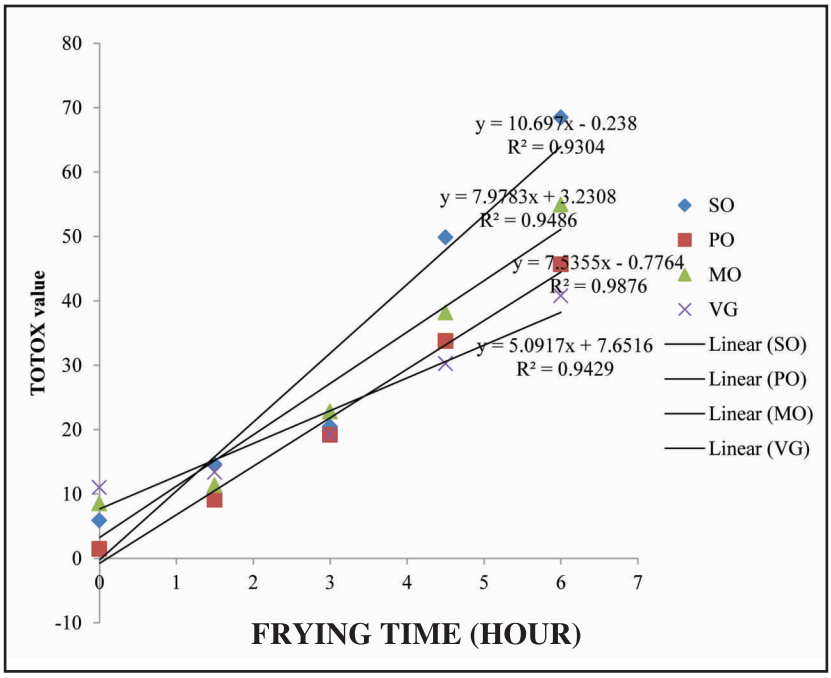

Figure 7: change of TOTOX value with frying time (lab).

Table 4: changes of P-AV and TOTOX value of burnt oil from sweet shop and fast food stall.

	Days	PO	SO
p-AV	0	.785±0.00	2.000±.026
	1	33.60±1.39	54.62±0.59
	2	46.31±1.02	82.53±0.20
	3	58.91±0.54	89.74±1.11
	4	65.20±0.77	104.24±0.56
TOTOX value (2PV + p-AV)	0	3.807±0.00	3.888±0.41
	1	38.864±1.39	58.756±0.37
	2	53.078±1.02	90.802±0.20
	3	70.512±0.92	105.460±1.85
	4	83.002±0.77	126.492±0.56

Values are expressed as mean±SD. (n=2).

The oils from the sweet shop and fast food stall also showed that the oxidative stability of palm oil is greater than soy oil. In Table 4 the TOTOX value (total oxidation) of soy oil (126.492) was found higher than the TOTOX value of palm oil (83.002) after 4 days of frying. But all the parameters of burnt oil from sweet shop and fast food stall was found higher than the fried oils in lab experiment.

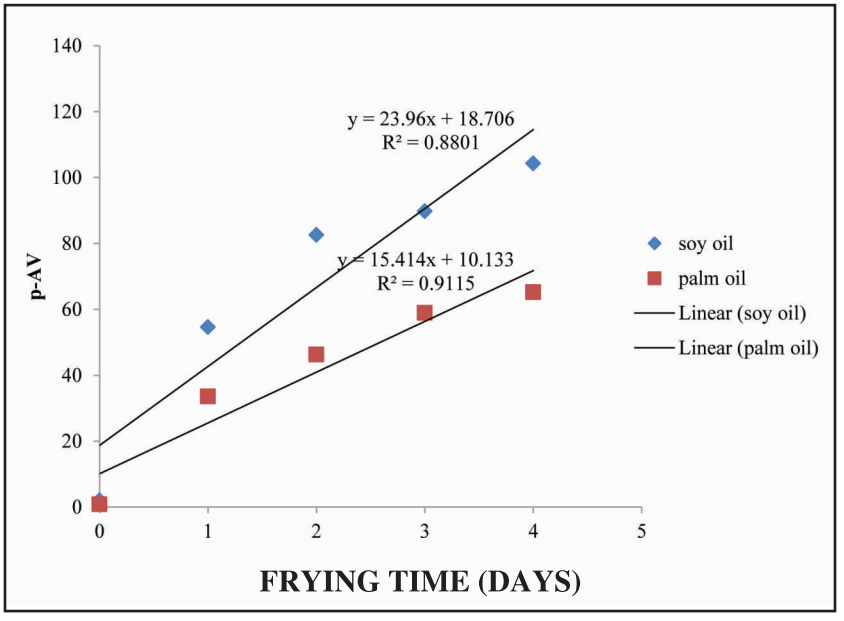

Figure 8: change of para - anisidine value with frying time (Sweet shop and fast food stall).

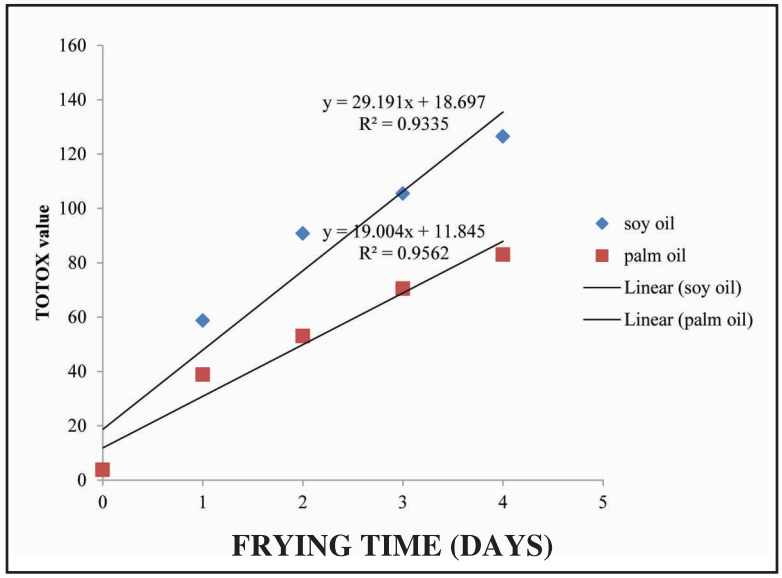

Figure 9: change of TOTOX value with frying time (Sweet shop and fast food stall).

4. Conclusion :

One of the most important conclusions to be drawn from this study is the oils (Palm oil, Dalda, Mustard oil) with the high percentage of saturated and monounsaturated fatty acid shows better oxidative stability than the oils (Soy oil) containing high percentage of polyunsaturated fatty acid (linoleic and linolenic type). So for the deep frying purpose the oils with high amount of saturated fatty acid are better than the oils with high poly unsaturation. While consumption of small amount of saturated fat is essential, researchers found high correlation between high consumption of such fats and coronary heart disease. The oil with high unsaturation become rancid at high temperature and also in case of industrial processing it can form Trans - Fatty acid which is harmful to our health. So it is important to use mixture of oils. That's why the blending of oils are gaining popularity now a days. The result also shows that at sweet shop and fast food stall the oils are heated over a long period and thus the chemical changes are rapid. So it is easy to say, these over burnt oils are harmful to our health and we must avoid the foods fried in this type of oil. Finally we have got our answer that deep frying of cooking oil is not safe.

References :

[1] Abdulkarim, S. M., Long, K., Lai O. M., Muhammad S. K. S., & Ghazali H. M. (2007). Some physico-chemical properties of Moringaoleifera seed oil extracted using solvent and aqueous enzymatic methods. *Food Chemistry,* 105, 1382-1389.

[2] Alireza, S., *Tan, C. P., Hamed, M. & Che Man, Y. B. (2010).Effect of frying process

on fatty acid composition and iodine value of selected vegetable oils and their blends. *International Food Research Journal*, 17, 295-302.

[3] AOCS methods *(fat, oils and lipid based analytical method*).

[4] Chong, Y.H. & Ng, T. K. (1991). Effects of palm oil on cardiovascular risk. *The Medical journal of Malaysia* 46 (1): 41–50.

[5] Food safety and standards authority of India ministry of health and family welfare government of India New Delhi 2012, Manual of methods of analysis of foods, lab manual 2, p. 27.

[6] Ghosh, P. K., Chatterjee D. & Bhattacharjee, P. (2012). Alternative Methods of Frying and Antioxidant Stability in Soybean Oil. *Advance Journal of food Science and Technology*, 4(1): 26-33, 2012 ISSN: 2042-4876© Maxwell Scientific Organization.

[7] Graham solomons, T.W., & Fryhle, C, B. Organic chemistry*, 9th edition, WILLEY INDIA EDITION* , 1073-1101.

[8] Grootveld, M., Silwood, C. J. L., Addis, P., Claxson, A, Serra, B. Bonet; Viana, Marta (2001). Health effects of oxidized heated oils. *Foodservice Research International,s* 13: 41–55.

[9] Gulla, S., Waghray, K. & Reddy, U. (2010). Blending of oils-does it improve the quality and storage stability, an experimental approach on soyabean and palm olein based blends. *American journal of food technology , Academic journal inc*. 5(3): 182-194, 2010. ISSN 1557-457.

[10] Hayes, K., Khosla, P. (2007). The complex interplay of palm oil fatty acids on blood lipids. *European Journal of Lipid Science and Technology,* 109 (4): 453.

[11] KockWai, T. Ng. (1994). The United Nations University Press, Food and Nutrition Bulletin, *Volume 15 (1993/1994), Number 2, June 1994.*

[12] Mehta, U. & Swinburn, B. (2001). A review of factors affecting fat absorption in hot chips. Crit.*Rev.Food Sci. Nutr.,* 41: 133-154.

[13] Melton, S. L., Jafar, S., Sykes, D. & Trigiano, M. K. (1994). Review of stability measurements for frying oils and fried food flavor. *J. Am. Oil. Chem. Soc.,*71:1301-1308.

[14] Mensink, R. P., &Katan, M. B. (1990). Effect of dietary trans-fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in healthy subjects. *New England Journal of Medicine,* 323(7), 439–445.

[15] Mensink, R. P., Zock, P. L., Kester, A. D, Katan, M. B. (2003). Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. *The American journal of clinical nutrition,* 77 (5), 1146–55.

[16] Petukhov, I., Malcolmson, L. J., Przybylski, R., & Armstrong, L. (1999). Frying performance of genetically modified canola oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society,* 76, 627–632.

[17] Shahidi, F., & Wanasundara, U. N. (2002). Methods for measuring oxidative rancidity in fats and oils. In C. C. Akoh& D. B. Min (Eds.), *Food lipids: Chemistry , nutrition, and biotechnology (2nd ed., pp. 465–482). New York: Marcel Dekker, Inc.*

[18] Tompkins C. & Perkins E.G. (1999). The Evaluation of Frying Oils with the p-Anisidine value. *Journal of American Oil Chemists' Society,* 76, 945-947.

[19] Yılmaz*, E. & Aydeniz, B. (2011). Quantitative Assessment of Frying oil Quality in Fast food Restaurants, *GIDA,* 36 (3): 121-127.

[20] Warner, K., & Knowlton, S. (1997). Frying quality and oxidative stability of high-oleic corn oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society,* 74, 1317– 1321.

FIBONACCI NUMBERS AND THEIR APPLICATIONS

Ashim Sarkar

Assistant Professor, Department of Mathematics
Asutosh College
e-mail : ashim.sarkar@asutoshcollege.in

Abstract: Fibonacci numbers give rise to a number widely known as the "Golden Ratio", denoted the Greek numeral Phi (φ). The Golden Ratio is a representation of beauty and perfection. These numbers are observed in many places around us, namely in nature, art and architecture, human body, music and even in the universe. They are in nature - in the distribution of sunflower seeds, branching in trees, phyllotaxis (the arrangement of leaves on a stem), hexagonal bracts of a pineapple, the flowering of an artichoke, the arrangement of a pine cone's bracts etc. the cochlea of our inner ear, and in the galaxies. Many flowers have the number of petals that correspond to a Fibonacci number. For example, white calla lilies have 1 petal each, euphorbia milii flowers have 2 petals, lilies and irises have 3 petals, buttercups have 5 petals, bloodroot and some delphiniums have 8 petals, corn marigolds have 13 petals; some asters and chicory have 21 petals and daisies can be found with 34, 55, or 89 petals. Fibonacci numbers are present in art- as a modern day photography techniques and in the works of old master artists such as Da Vinci and Michelangelo. They are also present in architecture - as seen in the Parthenon and Great Pyramids of Giza. Now a days Fibonacci numbers plays very important role in coding theory also.

Keywords: *Fibonacci Numbers, Golden ratio, Human body, Medical Sciences.*

Introduction:

The Fibonacci numbers or Fibonacci sequence are the numbers in the following sequence:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610….

Each number, except for the first two, is the sum of the previous two numbers in the sequence, i.e, Fn = Fn-1+ Fn-2, where Fn is the n_{th} Fibonacci number. The Fibonacci sequence is named after the Italian mathematician Leonardo Fibonacci.

Some Important Properties of Fibonacci Numbers

1. The sum of any ten consecutive Fibonacci numbers is divisible by 11:

2. The sum of the first n Fibonacci numbers is equal to the Fibonacci number two further

$$11 \mid (F_n + F_{n+1} + F_{n+2} + ... + F_{n+9})$$

along the sequence minus 1:

$$F_1 + F_2 + \ldots\ldots + F_n = F_{n+2} - 1.$$

3. The sum of the consecutive even-positioned Fibonacci numbers is 1 less than the Fibonacci number that follows the last even number in the sum:

$$F_2 + F_4 + \ldots\ldots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1.$$

4. The sum of the consecutive odd-positioned Fibonacci numbers is equal to the Fibonacci number that follows the last odd number in the sum:

$$F_1 + F_3 + F_5 + \ldots\ldots + F_{2n-1} = F_{2n}$$

5. The sum of the squares of the Fibonacci numbers is equal to the product of the last number and the next number in the Fibonacci sequence:

$$F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + \ldots\ldots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$$

6. The difference of the squares of two alternate Fibonacci numbers is equal to the Fibonacci number in the sequence whose position number is the sum of their position numbers:

$$F_n^{\,2} - F_{n-2}^{\,2} = F_{2n-2}$$

7. The sum of the squares of two consecutive Fibonacci numbers is equal to the Fibonacci number in the sequence whose position number is the sum of their position numbers:

$$F_n^{\,2} + F_{n+1}^{\,2} = F_{2n+1}$$

8.

$\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$,where m, n are integers greater than 2.

9. The sequence $\{x_n\}$ where $x_n = \dfrac{F_{n+1}}{F_n}$ is convergent.

1/1= 1

2/1= 2

34/21 = 1.61904...

55/34 = 1.61764…

3/2 =1.5

5/3 =1.6666…

8/5 =1.6

13/8 =1.625

21/13 =1.61538...

……

89/55 = 1.61818…

144/89 =1.61797…

233/144=1.61805…

377/233=1.61802…

610/377=1.61803…

……

Graphical Representation

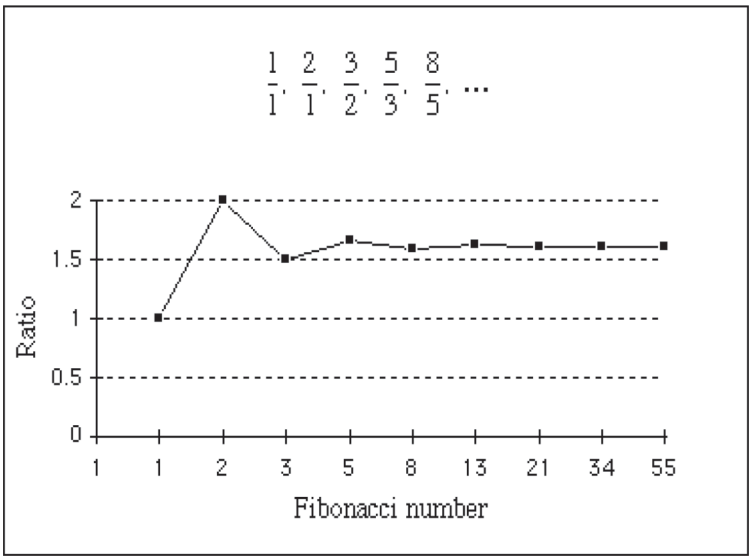

We can see from the graph also that the ratio to be converging to a particular value, whose value is 1·61803 approximately.

This number is called the Golden Ratio or The Golden Number, denoted by the Greek alphabet φ.

Analytical Proof of Convergence:

We have $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = \frac{3}{2}, x_4 = \frac{5}{3}, x_5 = \frac{8}{5}, x_6 = \frac{13}{8}$.....

We see that $x_1 < x_3 < x_5$...., *and* $x_2 > x_4 > x_6$....so that the sequence $\{x_{2n-1}\}$ is monotone increasing while the sequence $\{x_{2n}\}$ is monotone decreasing.

Also, $x_n = \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{F_n + F_{n-1}}{F_n} = 1 + \frac{F_{n-1}}{F_n}$. Since $0 < \frac{F_{n-1}}{F_n} \le 1$, for $n \ge 2$, so $1 \le x_n \le 2, \forall n \in N$ .Therefore the sequence

$\{x_n\}$ is bounded and as such the sequences $\{x_{2n-1}\}$ and $\{x_{2n}\}$ are also both bounded and hence both are convergent. Let $Ltx_{2n-1} = l_1, Ltx_{2n} = l_2$.

Now $x_{n+1} = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}} = \frac{F_{n+1}+F_n}{F_{n+1}} = 1 + \frac{1}{x_n}$. So $x_{2n} = 1 + \frac{1}{x_{2n-1}}$ and $x_{2n+1} = 1 + \frac{1}{x_{2n}}$.Then taking limits we have

$l_2 = 1 + \frac{1}{l_1}$ and $l_1 = 1 + \frac{1}{l_2} \Rightarrow l_1 = l_2$, since $l_1 l_2 \neq 1$.

Hence it follows that the sequence $\{x_n\}$ is convergent.

Let $Ltx_n = l$. Now $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n} \Rightarrow Ltx_{n+1} = 1 + Lt\frac{1}{x_n} \Rightarrow l = 1 + \frac{1}{l}$

$\Rightarrow l^2 - l - 1 = 0 \Rightarrow l = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, as $x_n \geq 1 \Rightarrow l > 0$.

Thus the sequence $\{x_n\}$, where $x_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$, converges to the number $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ which is approximately equal to **1·618034**.

Golden Ratio in Human Body

The golden ratio is manifested throughout the structure of the human body. Some of them are depicted below.

1. Human Hand

A. The ratio of the forearm to hand is φ.

B) Human hand has 5 fingers, each finger has 3 joints so that there are four bone parts in each finger (except the thumb). Average lengths of these four parts of a finger are in the ratio 2:3:5:8 (four consecutive numbers of Fibonacci sequence). The proportion of the middle finger to the little finger is also φ.

2. Human Body Structure.

A) The ratio of the distance between the naval and the top of the head

and the distance between the shoulder line and the top of the head is φ.

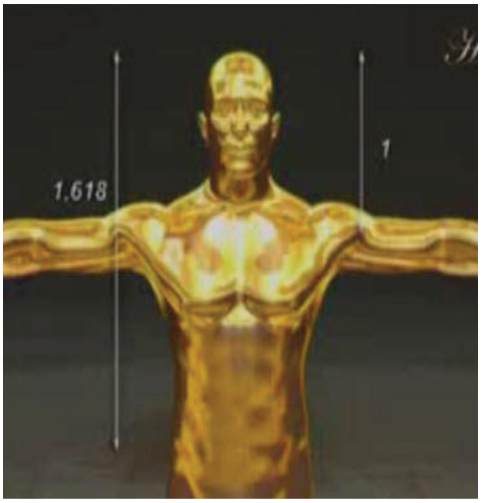

B) The ratio of the distance between the naval and the knee and the

distance between the knee and the end of the foot is φ.

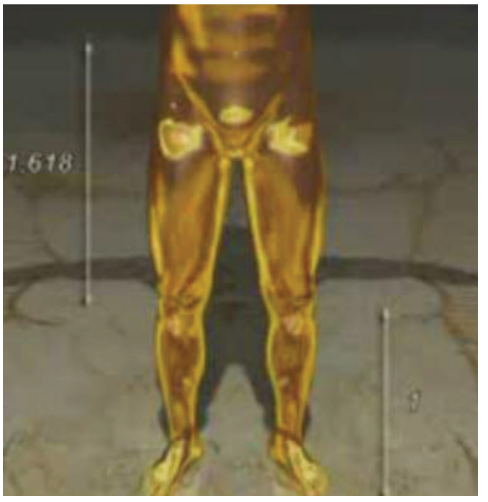

C) The ratio of the distance between the naval and the foot and the height of a human being is φ.

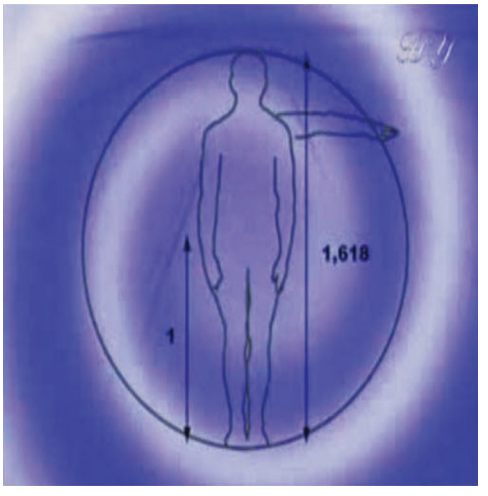

D) The ratio of the distance between the shoulder line and the top of the head and the length of the human head is φ.

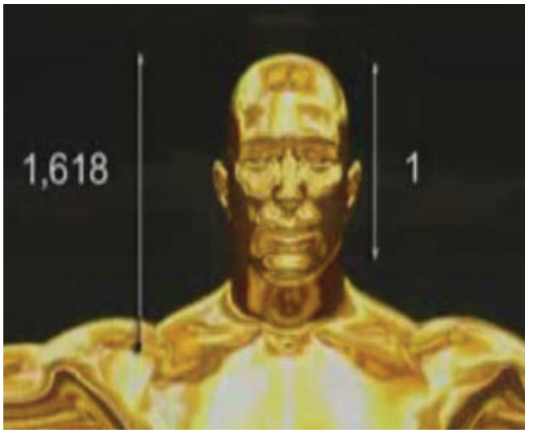

3. Human Dentistry.

A) The four front teeth, from central incisor to premolar are in the Golden Proportion to each other. This phenomenon can be used to assist us in perfecting the aesthetics of the eight front teeth.

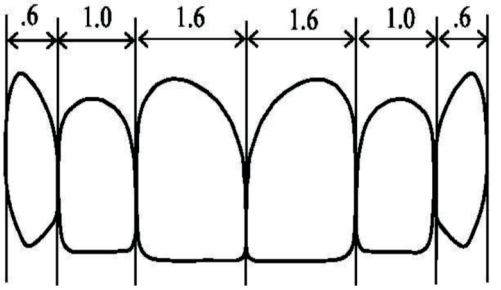

B) The height of the central incisor is in the Golden Proportion to the width of the two central incisors.

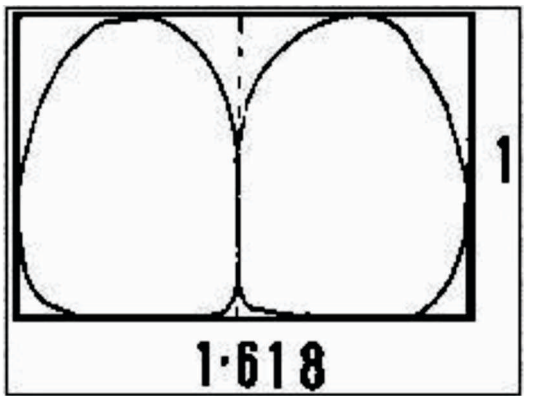

4. Human Face

A. Eyes to nose flair to nose base = φ.

B. Eyes to Nostril top to Center of lips = φ.

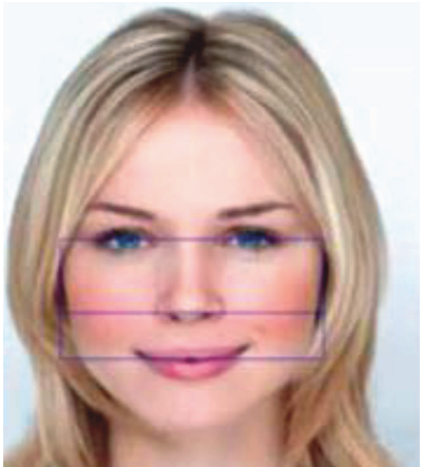

C. Eyes to Nose base to Bottom of lips = φ.

D. Eyes to Center of lips to bottom of chin = φ.

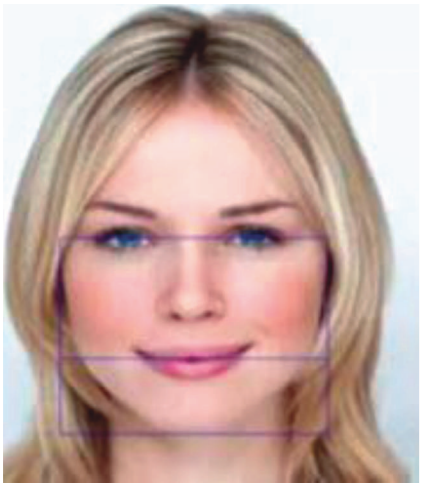

E. Nose flair to Bottom of lips to Bottom of chin = φ.

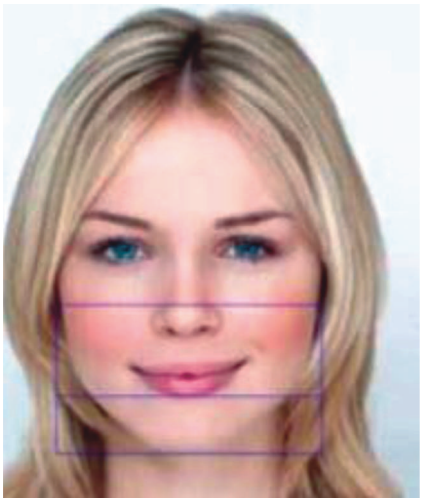

F. Nose flair to Top of lips to Bottom of chin = φ.

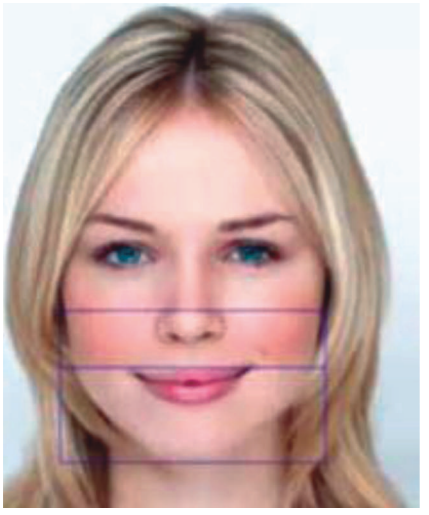

G. Top of lips to Bottom of lips to Bottom of chin= φ.

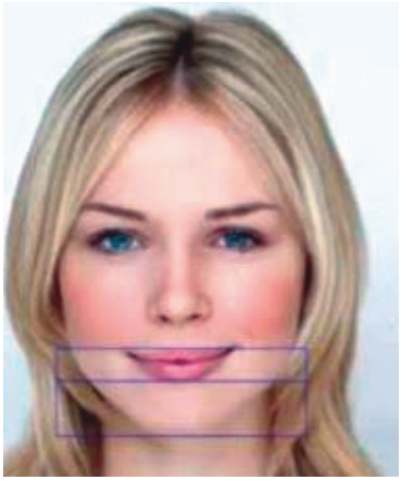

H. Top of lips to Center of lips to Bottom of lips = φ.

I. Arc of eyebrows to Top of eyes to Bottom of eyes = φ.

J. Arc of eyebrows to Top of lips to Bottom of chin = φ.

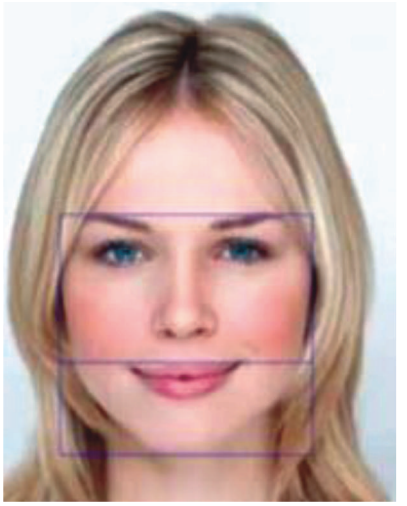

K. Side of face to Outside of eyes to Center of pupil = φ.

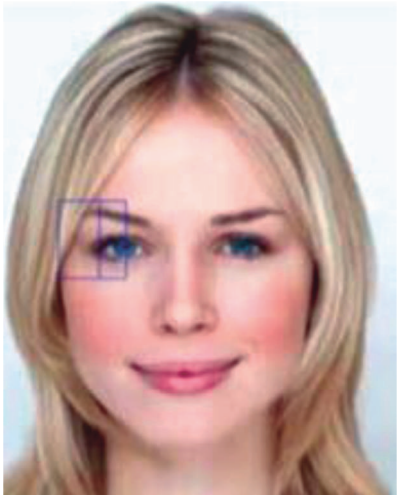

L. Side of face to Outside of iris to Inside of eye and Inside of eyebrow = φ.

M. Side of face to Inside of iris to Center of face = φ.

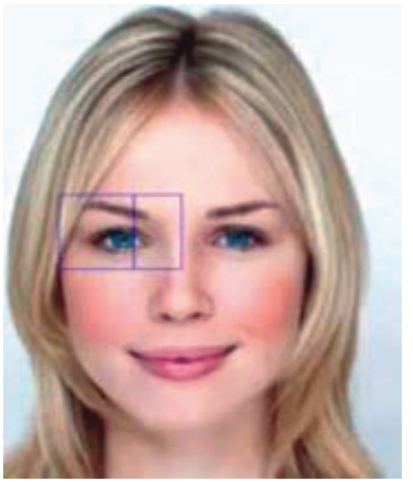

N. Side of face to Inside of nearer eye to inside of further eye = φ.

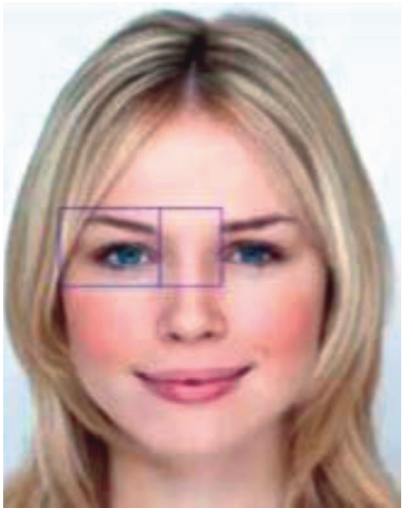

O. Side of face to Center of face to Outside of further eye = φ.

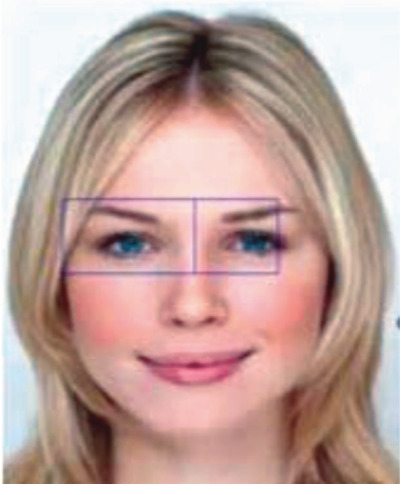

P. Side of face to Inside of further eye to opposite side of face = φ.

5. Human Lungs

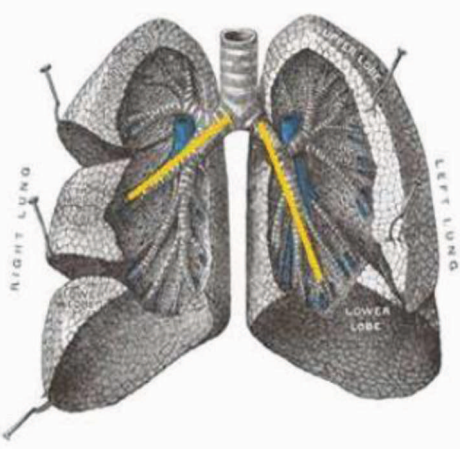

A) Golden ratio exists in the structure of the lung. One feature of the network of the bronchi that constitutes the lung is that it is asymmetric. For example, the windpipe divides into two main bronchi, one long (the left) and the other short (the right).This asymmetrical division continues into the subsequent subdivisions of the bronchi. It was determined that in all these divisions the proportion of the long bronchus to the short was always φ.

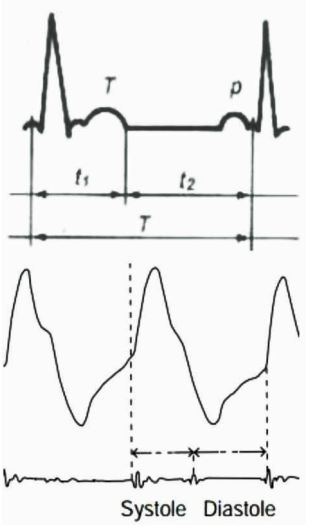

B) The pressure of the blood changes during the cardiac performance. It reaches the greatest value equal to 115−125 mm of the mercury column in the left heart ventricle at the moment of its compression (systole). At the moment of the cardiac muscle debilitation (diastole) the pressure decreases to 70− 80 mm of the mercury column. The ratio of the maximum (systolic) pressure to the minimum (diastolic) pressure is equal, on the average, to 1.6,that is, is close to φ. Also the durations of systole (t_1), diastole (t_2) and full cardiac cycle (T) are in the golden proportion, that is, T: $t_2 = t_2 : t_1 = \varphi$.

6. Human Gene

Genes are made of a chemical called DNA.The structure of a DNA molecule is double helix and is based on the golden ratio. It measures 34 angstroms long by 21 angstroms wide for each full cycle of its double helix spiral. 34 and 21, of course, are numbers in the Fibonacci series and their ratio is 1.6190476, which is close to the Golden Ratio φ.

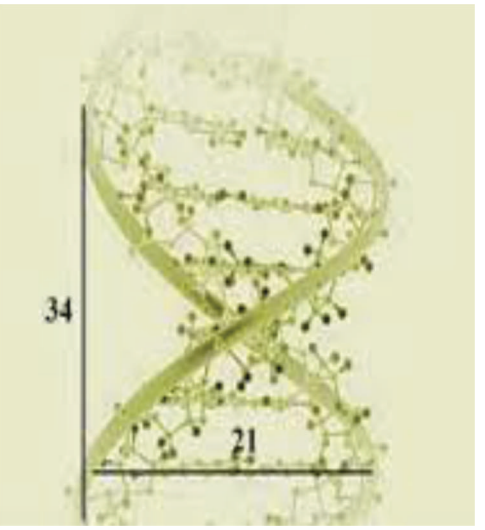

APPLICATIONS IN MEDICAL SCIENCES

It is an experimental truth that more the presence of Golden Ratio in an object, more it is perfect from every aspects and pleasing to our eyes. Since the Golden Ratio can always be observed in the human body, it can be used in different fields of medical sciences such as artificial limbs, orthopedics, anatomy, cardiology, plastic surgery, genetics etc. That is why the Golden Ratio plays an important role to the human beings.

CONCLUDING REMARKS:

The golden ratio φ is a number with special properties and aesthetic significance in nature. An enormous number of things in the universe are closely related to the ratio, including our human body. In this article some of the aspects of the human body are depicted where golden ratio is observed. This very fact could be of great use in the study of medical sciences. For accuracy in some medical treatments, Golden Ratio might be a great resource.

References:

[1] The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number by Mario Livio(Publisher: Broadway Books, Year: 2003, ISBN 10: 0767908155, ISBN 13: 9780767908153)

[2] Fibonacci and Phi by Dawson Merrill (http://www.goldenratio.org/info/aboutthispage.html)

[3] The Divine Proportion: A study in mathematical beauty by H E Huntley (Dover Publications, Year:1970 ISBN 10: 0486222543, ISBN 13: 9780486222547)

[4] The Golden Section by Garth Runion (Dale Seymour Publications, January 1,1990, ISBN-10 : 0866515100, ISBN-13 : 978-0866515108)

OBSERVATION OF EQUATORIAL IRREGULARITIES BY MST RADAR AND GPS IN A COLLOCATED IONOSPHERIC VOLUME

Dr. Aditi Das

Assistant Professor, Department of Physics
Asutosh College
e-mail : aditi.das@asutoshcollege.in

Abstract : Backscattered data of MST radar situated at Gadanki, Tirupati, India are analyzed for some magnetically quiet days. The days when plume is observed at Gadanki, GPS satellite signals are checked from Kolkata. Those satellites are selected which are collocated with the north beam of the radar signal in the ionosphere observed from Gadanki. GPS satellites showed scintillation on those days, when from the Radar backscattered data ESF/plume was observed. In the early evening hours, GPS scintillation in association with strong 50 MHz radar backscatter in a common ionospheric volume implying near simultaneous generation of large scale and 3 meter irregularities.

Keywords : *Ionosphere, Equatorial Spread F, GPS, Scintillation*

1. Introduction :

The dynamics of the plasma bubbles is one of the important aspects of the phenomenon of Equatorial Spread F (ESF). Since its discovery near a century ago (Booker and Wells, 1938), considerable experimental and theoretical investigations have been undertaken towards an understanding of Equatorial Spread F (ESF) phenomena (Fejer & Kelly, 1980).

The evolution of ESF irregularities, leading to a wide range of scale sizes, seems to involve the operation of a hierarchy of processes (Ossakow, 1981). Experimental (Kelley et al., 1976; Woodman and La Hoz, 1976) and numerical simulation studies (Scannapieco and Ossakow, 1976) of the nighttime equatorial F region has given evidence for rising bubbles (plasma density depletions). That the rising plume represents the plasma bubbles has been confirmed through evidence from combination of radar, rocket and satellite observations (Tsunoda, 1980; Rino et al., 1981). The bubbles so generated steepen on their top, get polarized, and rise to the topside of the ionosphere through enhanced electrodynamic drift (Anderson and Haerendel, 1979).

Studies of ESF using the 50 MHz radar at Jicamarca, observatory near Lima, Peru have been carried out since the sixties (Farely et al., 1970; Woodman & LaHoz, 1976; Farely & Hysell, 1996). The plumes observed on the radar Range-Time-Intensity (RTI)

maps have been interpreted in terms of plasma bubbles generated in the post sunset bottomside F region. Tsunoda & White (1981) first reported that the bottomside F layer is indeed altitude modulated, and the altitude modulation actually leads to the large-scale characteristics of equatorial backscatter plumes. Coordinated study of equatorial scintillation, in situ and radar observation of nighttime F region irregularities were done by Basu et al. (1980). Rastogi and Aarons (1980) attributed the seasonal variations of the occurrence of ESF at different longitudes to the time delays between the sunset and reversal of the ionospheric electric fields. Raghava Rao et al. (1992) studied the effect of vertical winds on Rayleigh-Taylor growth rates and reported that downward wind pushing the F-region into lower altitudes of higher recombination rates does not favor the Rayleigh-Taylor growth rate, while an upward wind acts in a way such that it lifts the ionization to the higher altitudes favouring the Rayleigh Taylor instability growth. Chandra et al. (1997) operated digital ionosonde, scintillation recording system and Langmuir probe carried by a RH-560 rocket during Spread-F condition from SHAR (14° N dip), a low latitude station in India and reported that the virtual height of the F layer (h´F), rose to higher altitudes (~400 km) on Spread-F days than non spread F days (~ 300-320 km). It has also been reported that the electric field reversal occurred around 1930 LT on Spread-F days and around 1900 LT on days without spread F. The upward vertical drift velocities exceeded 50m/sec on spread F days. Rao et al. (1997) made a study on radar observations of updrafting and downdrafting plasma depletions associated with the ESF at Gadanki, Tirupati. Hysell (2000) made an overview and synthesis of plasma irregularities in ESF and reported that three varieties of irregularities occur, all produced by ionospheric interchange instabilities. Type-I and type-II irregularities exist on magnetic flux tubes controlled by the E region and F region dynamo respectively, whereas type-III irregularities are due to very strong polarization electric fields. Patra et al. (2005) made simultaneous observations of equatorial Spread-F irregularities with an 18 MHz radar from Trivandrum and a 53 MHz radar from Gadanki and found that the irregularities occurred at both the locations nearly at the same time but are observed for longer duration at Gadanki than at Trivandrum.

The main objective of this work is collocated observation of equatorial irregularities for geomagnetically quiet days using Gadanki radar data and GPS scintillation data. For this purpose, those days are selected for analysis when Radar backscattered data are available during the equinoxes of 1998-2004. The operating frequency of Gadanki radar is 53 MHz i.e its wavelength is approximately 6 meter. The radar can detect the irregularities of scale sizes of half the wavelength of the transmitting signal which is 3 meter. The GPS satellite signals are examined at the common ionospheric volume probed by the radar beam and the GPS link. Since GPS satellites orbit the earth at 20,200 km at different look angles, the corresponding subionospheric points at 350 km height even from Kolkata may sometimes be close to the NARL north beam and collocated observation is possible. Figures 1 shows locations of Tirupati, Kolkata and position of northern crest of EIA in Indian map.

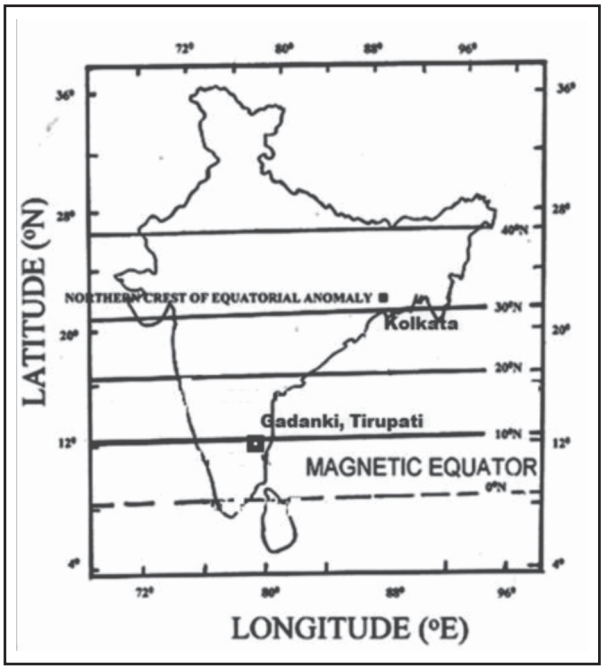

Figure 1 : Location of Kolkata, Gadanki and Northern crest of EIA

2. Data :

In the present work the F region backscattered data of MST radar situated at Gadanki (13.5° N, 79.2° E, 6.3° N mag lat), Tirupati is used for the observation of equatorial irregularities. The MST Radar is a high power, coherent, pulse Doppler radar operating in the VHF band of frequency. It is an excellent system for atmospheric probing in the regions of Mesosphere, Stratosphere and Troposphere (MST) covering up to a height of 100km. It is also used for coherent backscatter study of the ionospheric irregularities above 90km. It operates at 53 MHz with a peak power of 2.5 MW. It is sensitive to backscatter from waves which satisfy Braggs matching condition. This condition requires that kr = ks + km, where kr is the radar wave vector, ks the scattered wave vector and km is the wave vector in the medium. Since ks = - kr for backscatter, it follows km = 2 kr. Thus for 53 MHz radar (=6 m) it detects only waves with wave vectors corresponding to a 3 m wavelength. The Phased antenna array consists of two orthogonal sets, one for each polarization arranged in 32 x 32 matrixes over an area of 130 x 130 meter. The radar beam can, in principle, be positioned electronically at any look angle within ±20° off zenith in the East-West and North-South planes. For the spread F observation the radar beam is oriented at 14.8° due magnetic north which is the nominal direction looking transverse to the earth's magnetic field at a height of about 333km to satisfy Bragg's matching condition.

The signal-to-noise ratios (SNR) of the L1 (1575.42 MHz) transmissions from the

GPS and GLONASS satellites has been observed from Kolkata by a stand-alone C/A code Ashtec (model GG24) receiver The geomagnetic data are available from the website http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/. The two cases are discussed here.

3. Results :

(a) March 20, 1998 :

Range-Time-Intensity (RTI) maps of March20, 1998 which represents backscattered intensity as a function of altitude and time, is shown in Figure 2 where the different shades denote different signal to noise ratio (SNR) in decibels (dB).

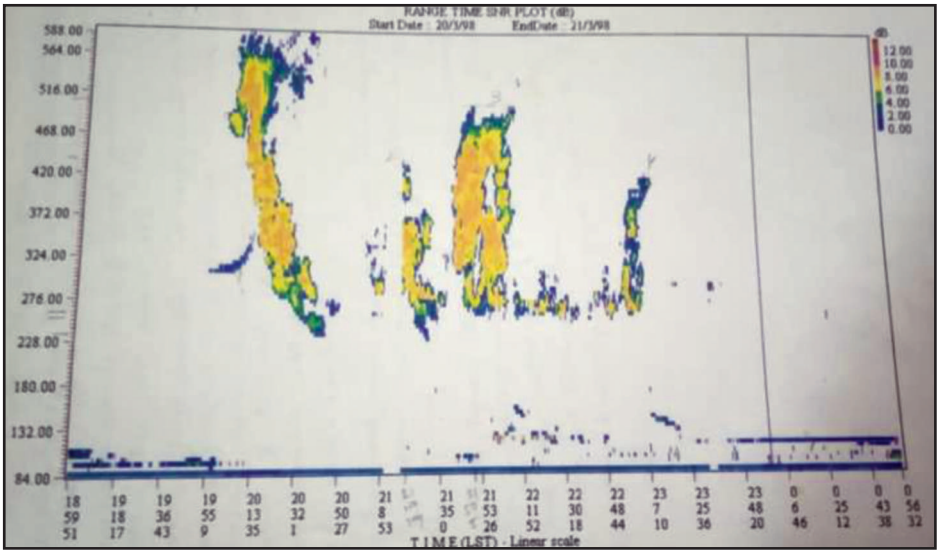

Figure 2

The figure shows the series of plumelike structure from nearly 20:00 IST [IST =UT + 5:30] to 23:00 IST. Four distinct plume structures with intensities modulated in time can be found. The first plume of nearly vertical structure extends from 230 km to 580 km around 20:00 IST. The second plume was observed at about 21:19 IST at an altitude of about 230 km and reached a height of about 430 km. The third plume is observed around 21:50 IST and extends from 260 km to 505 km. The fourth and less intense small plume is observed at 23:00 IST from 254 to 420 km height. A plume in the RTI map is an indicator of a deep plasma depletion rising up through the F peak under the influence of well developed irregularities which are thought to be generated by interchange or generalized Rayleigh –Taylor instability. The tilt of the plume could be explained by a sheared drift in the ionosphere when the east-west drift is faster at lower altitudes than at higher ones (Woodman and Lahoz, 1976). From the hourly values of Dst index it is found that there is no magnetic storm on this day.

The hourly polar plots of Scintillation Index (S.I.) calculated from CNO of the GPS satellites signal recorded at Kolkata during 16:00-18:00 UT (19:30-23:30 IST) on this same day are shown in Figure 3.

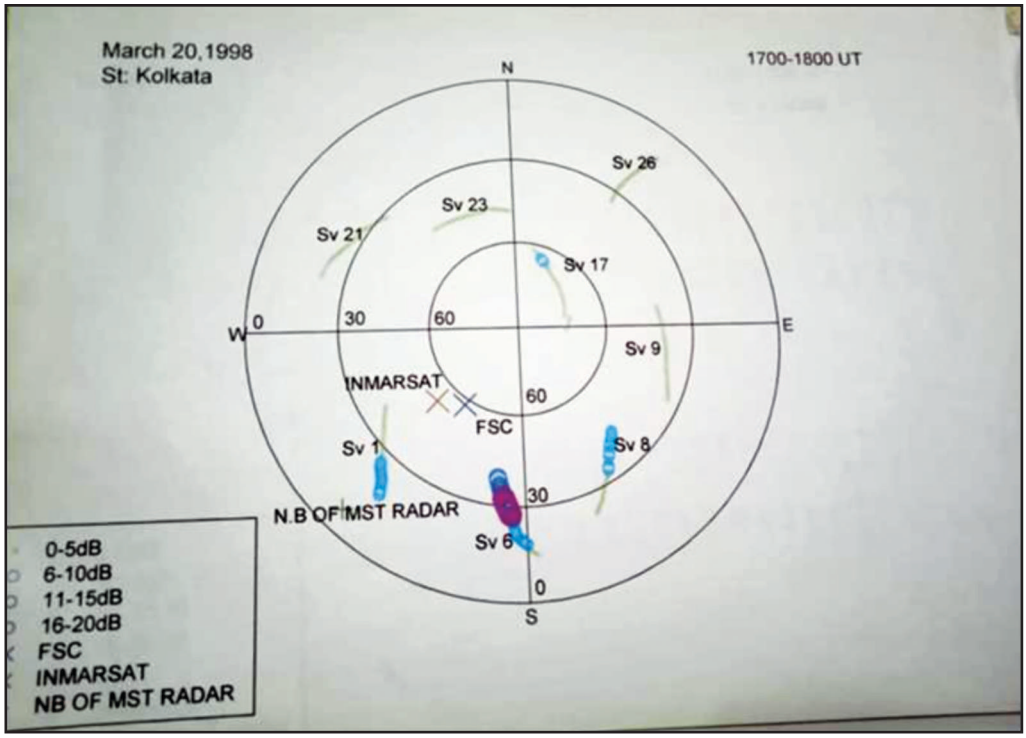

Figure 3

The 'plus sign' denotes the 350 km subionospheric point of the north beam of MST radar at Gadanki, Tirupati which is orthogonal to the magnetic field line. The different ranges of SI are denoted by different shades. It is observed that GPS Sv 1 is nearly in the common ionospheric volume probed by MST radar beam and it showed scintillation in the range of 6-10 dB and 16-20 dB in conjunction with the backscatter returns from 3 meter irregularities during 16-17 UT and 17-18 UT

(b) March 17, 1999 :

On this day also, 4 plume structures was developed near Gadanki, Tirupati, as observed from radar 50 Hz backscattered data. There is a clear picture of modulation of base of the plumes with progress of time. Figure 4 shows the RTI plot of March 17, 1999. The polar plot of S4 data from GPS CNO data are shown in Figure 5. It is found that during 15:30-16:30UT SV29 is situated near the MST radar north beam and it showed scintillation in this satellite link with S.I. in between 16-20 dB.

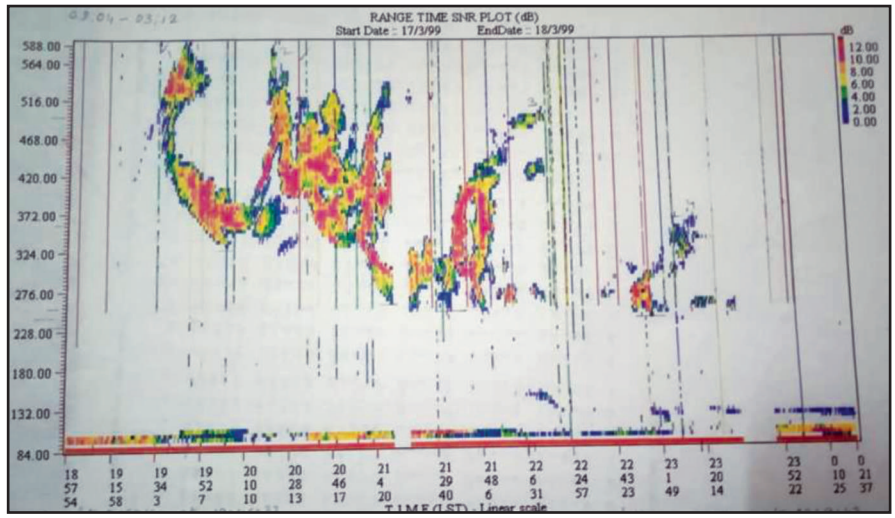

Figure 4

4. Discussions :

Simultaneous radar and GPS signal scintillation observations at and Gadanki help to understand the ESF hierarchy. On both the day, The height of the plumes slowly decreased with progress of time reavealing the descending nature of F region during nighttime. It is found that on March 20, 1998 the plumes were detected by MST radar from Gadanki. GPS satellites encounter scintillations >10 dB at the common ionospheric volume probed by the north beam of MST radar. Observing the simultaneous observation of radar backscattered plume and GPS scintillation it proves that during the early phase of ESF, small scale and medium scale irregularities implies simultaneous generation of large scale (nearly 1 km to 100m) and 3 m irregularities near the geomagnetic equator.

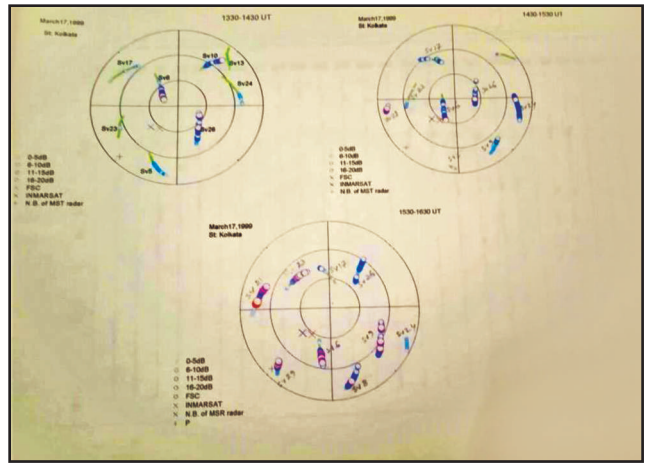

Figure 5

References :

[1] Anderson, D. N., & Haerendel, G. (1979). The motion of depleted plasma regions in the equatorial ionosphere. *J. Geophys. Res.,* 84.4251-4256.

[2] Basu, Su., Basu, S., Mullen, J. P., & Bushby, A. Long-term 1.5 GHz amplitude scintillation measurements at the magnetic equator. (1980). *Geophys. Res. Lett*., 7, 259-262.

[3] Booker, H. G., & Wells, H. G. (1938). Scattering of radio waves in the F-region of ionosphere, *J. GeoPhys. Res.,* 43, 249-256.

[4] Chandra, H., Vyas, G. D., Sinha, H. S. S., Prakash, S., & Misra,R. N. (1997). Equatorial spread-F campaign over SHAR, *J. Amos. Terr. Phys.*, 59, 191-205.

[5] Farely, D. T., Balsley, B. B., Woodman, R. F., & McClure, J. P. (1970). Equatorial Spread F:Implications of VHF Radar Observations, *J. Geophys. Res.*, 75, 34, 7199-7216.

[6] Farely, D. T, & Hysell, D. L. (1996). Radar measurements of very small aspect angles in the equatorial ionosphere, *J. Geophys. Res.,* 95, 5177-5184.

[7] Fejer, B. G., & Kelly, M. C. (1980). Ionospheric Irregularities, *Rev. Geophys,* 18,401. .Hysell, D. L. (2000). A review and synthesis of plasma irregularities in equatorial spread F, *J. Atmos. Sol. Terr. Phys.,* 62, 1037-1056.

[8] Kelley, M. C., Haerendel, G., Kappler,H., Valenzuela,A.,Balsley, B. B., Carter,D. A., Ecklund, W. L., Carlson, C. W., Hausler, B. & Torbert, R. (1976). Evidence for a Rayleigh-Taylor type instability and Upwelling of depleted density regions during equatorial spread F, *Geophys. Res. Lett.*, 3, 448-450.

[9] Ossakow, S. L. (1981). Spread-F theories-A review, *J. Atmos. Terr. Phys.,* 43, 437-452.

[10] Patra, A. K., Tiwari, D., Sripathi, S., Rao, P. B., Sridharan, R., Devasia, C. V., Viswanathan, K. S., Subbarao, K. S. V., Sekar, R., & Kherani, E. A. (2005). Simultaneous radar observations of meter-scale F region irregularities at and off the magnetic equator over India, *J. Geophys. Res.,* 110, A02307, doi:10.1029/2004JA010565.

[11] RaghavaRao, R., Sekar,R. R., & Suhasini, R. (1992). Nonlinear numerical simulation of equatorial spread-F-Effects of winds and electric fields, *Adv. Space Res.,* 12, 227-230.

[12] Rao, P. B., Patra, A. K., ChandrasekharSarma, T. V., Krishnamurthy, B. V., KSubbarao, S. V. & Hari, S. S. (1980). Radar observation of updrafting and downdrafting plasma depletions associated with equatorial Spread F, *Radio Sci.,* 32, 1215-1227.

[13] Rastogi, R. G., & Aarons, J. (1980). Nighttime ionospheric radio scintillations and vertical drifts at the magnetic equator, *J. Atmos. Terr. Phys*., 42, 583-591.

[14] Rino, C. L., Tsunoda, R. T., Petriceks, J., Livingston, R. C., Kelly, M. C. & Baker, K. D. (1981). Simultaneous rocket-borne beacon and in situ measurements of Equatorial Spread F- Intermediate wavelength results, *J. Geophys. Res.*, 2411-2420.

[15] Scannapieco, A. & Ossakow, S. L. (1976). Nonlinear equatorial spread F, *Geophys. Res. Lett.*, 3, 451-454.

[16] Tsunoda, R. T. (1980). Magnetic-field-aligned characteristics of plasma bubbles in the nighttime equatorial ionosphere, *J. Atmos. Terr. Phys.,* 42, 743-752.

[17] Tsunoda, R. T., & White, B. R. (1981). On the generation and growth of equatorial backscatter plumes, 1, Wave structure in the bottomside F layer, *J. Geophys.Res.,* 86, 3610-3616.

[18] Woodman, R. F. and La Hoz, A. (1976). Radar Observations of F region Equatorial Irregularities, *J. Geophys, Res.,* 81, 31, 5447-5466.

UNIQUE WASTE WATER CULTURE SYSTEM – HIDDEN GEM OF KOLKATA PORT TRUST AREA

Basudha Basu

SACT, Department of Zoology
Asutosh College
e-mail : basudha.basu@asutoshcollege.in

Abstract : Purified sewage or industrial water can be reused after proper treatment for pisciculture. For this paper, studies were conducted on the Mudialy Fishermen's cooperative society, Taratala, Kol – 700024. Its a hidden gem in Kolkata Port Trust area not much in the lime light. Waste water including heavy metals, domestic sewage, waste from industrial belt come into inlet ponds. Incoming industrial, domestic waste water moves via stilling ponds. At first waste water passes through six ponds which are known as 'anaerobic tanks' in which water is treated with lime which serves to neutralise acids while also precipitating various metals into solids that can be recovered. Water hyacinths are kept in tanks. Hyacinth is a well known saprophytic plant that derives nutrition from dead and decaying matter, so these plants are used to facilitate absorption of oil, grease, heavy metals. Second tank into which water moves from the first through a narrow passage (culvert in the upper level) is used to rear exotic species, which are used as natural pollution indicators. After that water flows into the third pond through a canal which is filled up with saprophytic water hyacinth. In this way water quality is improved at each step and therefore nutrients and mineral contents can be recycled and water can be utilised for fish culture. Through waste water processing, levels of suspended, dissolved, volatile solids, alkalinity, phosphate, mercury, COD, BOD can be lowered. This purified waste water can be used for cultivation of fishes. In this way waste water is processed and can be reused in pisciculture as well as help to keep the environment pollution free.

Keywords : *Hidden gem, waste water processing , unique fish culture.*

Introduction :

Nature park is mainly Known as Mudialy Fishermen's Cooperative Society (MFCS). Nature Park or MFCS mainly deals with waste water processing and pisciculture.It is situated at south belt of kokata,Taratala,Kolkata – 700024.

Brief idea on MFCS :

MFCS is situated in the south – western fringe of Kolkata.It is mainly water logged waste land filled with water hyacinth used by Kolkata Port Trust for dumping garbages.

Aim of MFCS :

MFCS is running a waste water processing system in a sustainable way to ensure the reduction of water pollution and along with culture of fishes in the processed water.

Necessity of waste water processing :

Waste water including domestic sewage and waste from mainly agro-industrial areas can be purified step by step. Purified sewage or agro- industrial water can be reused after proper treatment for pisciculture as nutrient and mineral contents of water are recycled. By the help of waste water treatment method we are focusing towards the future prospect of resolving the water scarcity issues and we can use the processed water for culture of fishes too.

Source of waste (INLETS) :

Sewages from large number of industries are coming to the MFCS and get processed. Industries like various petrol pump and petroleum companies i.e. Hindustan petroleum, factories like steel, leather, metal box etc, manufacturing companies like Voltus, Hindustan Sanitaryware, Balmer Lawrie, I.T.C, Brooke Bond, Kajaria etc, are included and many more. Domesticated sewages are coming from KOPT. (Kolkata Port Trust) quarters.

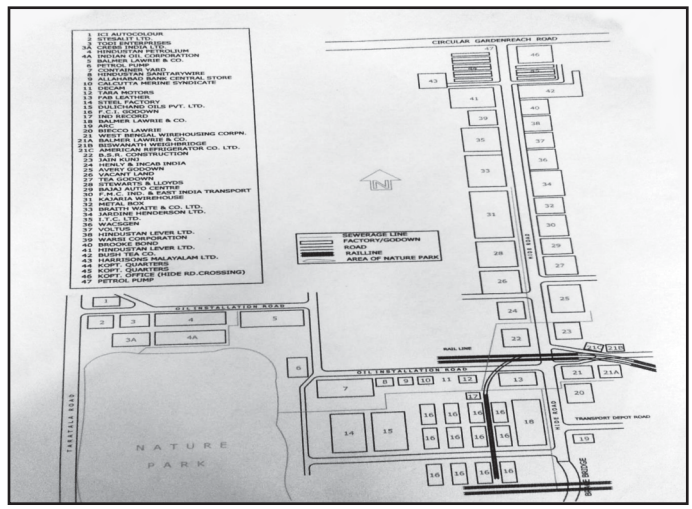

Fig : 1 Names And Distribution of Industries Surrounding Nature Park (MFCS)

Outlets :

Ganga through Moni Khal (canal).

Basic culture protocol :

The basic principle of waste water processing in the MFCS is totally carried out in a natural way.

Whether the water is flowing or stagnant in nature :

Water is flowing in nature.

Flora and fauna in MFCS :

Flora :

Various kind of algae (mainly chlorophyta-green algae), azolla (Azolla pinnata), water hyacinth *(Eichhornia crassipes)*.

Fauna :

Lots of fish faunas are being identified in their ponds. They are prawns and crat fauna, snail fauna and snake fauna. Other than those–'Chanda', 'Mourala' and 'Punti' which are known to be fresh water varieties of sensitive nature.

Waste water treatment procedure in MFCS :

1. Waste water come into the inlet pond.
2. At first waste water passes through six ponds known as 'ANAEROBIC TANKS'.
3. Within anaerobic tanks water is treated with lime which serves to neutralise acids while precipitating various metals into solids that can be recovered.
4. Water hyacinths are kept in the tanks. Hyacinth is a well known saprophytic plants that derive nutrition from dead and decaying matter, so these plants are used to facilitate the absorption of oil , grease and toxic materials.
5. The second tank into which water moves from first through a narrow passage(culvert at the upper level).
6. This place is used to rear exotic, predatory, omnivorous fishes like singhi *(Heteropneustes sp.)*, magur *(Clarias sp.)*, koi *(Anabas sp.)* which are used as natural pollution indicators.
7. After that water flows into third pond through a canal which is filled up with saprophytic water hyacinth.
8. By this way the water quality is improving in each step and mineral contents of the waste water can be recycled and now water can be utilised for pisciculture.

Canal lock gate :

Lock gate system is used at MFCS. There are two lock gate systems -one lock gate at entry point of waste water and the other one is at discharge or exit site(the point where water moves to another pond or to the river).

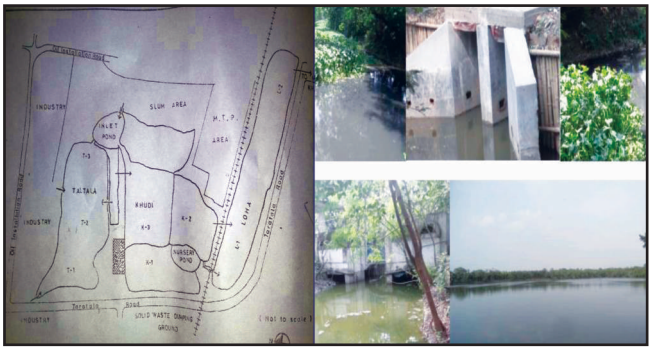

Fig : 2 Overview of Waste Water Processing Model

Positive aspects of waste water processing :

- Through the waste water treatment level of suspended, dissolved, volatile solids, alkalinity, phosphate, COD,BOD can be lowered . This purified waste water can be used for cultivation of fishes.
- By treating waste water it serves proper scope for purification which in turn decreasing the water pollution as well as provides protection of environment from pollution.
- This treatment helps to produce disease free fishes.
- Waste water treatment ensures large amount of aquatic resources.

Treatment & Pisciculture in MFCS :

- Regular fishing plays a critical role in purifying the water as well as the environment and to maintain the ecological balance.
- Fishes are cultured at MFCS namely -catla *(Catla catla)*, Rohu *(Labio rohita)*, bata *(Labeo bata)*, mrigal *(Cirrhinus mrigala)*, common carp *(Cyprinus carpio)*, silver carp (Hypophthalmichthyes molitrix) etc.
- As the water is being processed so that there is less possibility of disease occurence in fishes .

Fig : 3 Culture in MFCS

Map of MFCS :

Uniqueness of MFCS other than East Kolkata Wetland :

At MFCS waste water is being processed by canal system, so that sedimentation takes place which helps to process the waste water. In case of East Kolkata Wetland oxidising tank, settling tanks and solar energy are used for processing of water.

According to the 1990 NEERI report, the climatic condition of the area helps to facilitate conversion of organic waste into protein rich micro algae for raising up catch of fish without much supplementary feeding and to reduce the cost of aquaculture.

Regular monitoring is done in MFCS. Monitoring by regular fishing is important as if any diseased fishes are found during fishing then it will be an indicator for quality of water.

Wetlands are known as natures's kidney. MFCS is maintaining wetlands. By processing the waste water and culturing the fishes in processed water MFCS helps in maintaining ecological balance.

Limitation of the waste water treatment :

- As in this system water is processed by water hyacinth so it is time consuming.
- Some scientific gadgets can be used for the waste water-treatment. Filters & chimneys can be introduced to the initial step so that the process can be conducted faster.
- This process is scientifically approved but it is not being introduced in to local drainage system, domesticated sewage system and river water processing.
- Till now this treatment procedure is not included for chemically treated water.

MFCS is not under the limelight :

MFCS has achieved the national productivity award for a record five times for production of fishes. Despite the hard work of members as well as fishermen, still they have not received much appreciation and recognition. Their unique efforts and the culture system is not known to the worldwide. East kolkata wetland is in lime light but there are very few who knows about MFCS - we need to concentrate on the fact.

Future investigation :

There is no complaints against the cultured fishes in this water. Fish growth is quite normal. Fish health is also normal. The taste of cultured fishes are appreciated by consumers so that from organoleptic point of view this waste water processing & pisciculture is acceptable. Since we have to prove that fish produced in such a system is totally safe for human consumption.

World is suffering from scarcity of water and so that the India is. So we should concentrate on waste water processing for further utilisation .

Future strategy of my work is to prove beyond any doubts & to make this processed waste water pisciculture scientifically acceptable.

References :

[1] Samar K. Datta & Milindo Chakrabarti (1997). A management perspective for sustainable fisheries under globalised market co conditions.

[2] Sayantan Bera. Fish and a philosophy.

[3] B.B.Jana , R .N. Mandal , P. Jayasankar (2018) . Waste water management through aquaculture

Ackowledgement :

Special thanks to Mr. Samir Rang (MFCS).

Asutosh College

Asutosh College, formerly known as South Suburban College, was established in 1916 by Sir Asutosh Mookerjee, the renowned mathematician, educationist, jurist, and the second Indian Vice Chancellor of the University of Calcutta, whose life's mission was to open the doors of modern education in the western tradition to students of his motherland.

Asutosh College Teachers' Council

This is a statutory advisory body comprising all members (substantive) of the teaching staff of the college, with the Head of the institution as the *ex officio* Chairman. Prof. Apurba Ray, the Vice Principal, is the current Chairman, and Dr. Abhik Kundu, Associate Professor in Geology, the current Secretary.